বন্দীর প্রেম

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

মডার্ণ বুকস্ লিঃ
১৬০/১এ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ

১৩৫৩

মূল্য আড়াই টাকা

শ্রীমুরারী মোহন সাহা (গ্রন্থ বিতান) কর্তৃক প্রকাশিত ও ১৬৮নং রমেশ দত্ত ষ্ট্রীটের
মিনার্ভা প্রিণ্টিং হাউস হইতে অতুল মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

মুরলাদেবীকে—
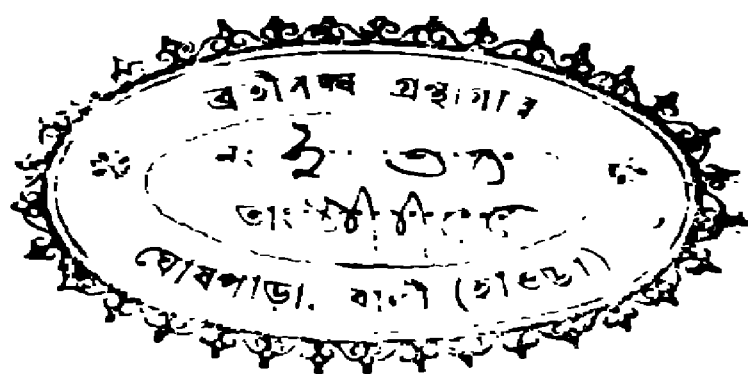
১৯৪৫ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসের কয়েকটি দিনে প্রেসিডেন্সিজেলে এই লেখাটুকু শেষ হয়—তখনও হিটলার জীবিত ছিলেন এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের খবর দেশে পৌঁছায় নাই। পুস্তকে উল্লিখিত ব্যক্তিদের নামগুলি কাল্পনিক।

৫-১-৪৮
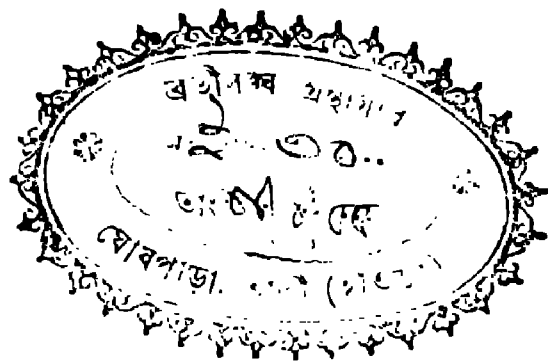
বন্ধু, শোনো,

মন আমার অঘটন ঘটাইয়া বসিয়াছে, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত। আমারই মন, শেষে কিনা আমাকেই ধরাশায়ী করিবার মতলব তার, নালিশ যে করিব সে মুখও নাই। ব্যস্ত হইও না, বলিতে যখন বসিয়াছি, খুলিয়াই বলিব। সত্য বা মিথ্যা, ভালো বা মন্দ, উচিত বা অনুচিত যে বা যিনিই হউন, কারো মুখ চাহিয়া কথা বলা আমার দ্বারা সম্ভব হইবে না, এক্রুটির কথাটা গোড়াতেই মনে করাইয়া দেওয়া দরকার হইল।

কাণ্ডটা আজ ভোরেই ঘটে। যখন নিদ্রার অন্ধকার পার হইয়া তন্দ্রার সীমান্তও অতিক্রম করিয়া জাগ্রত চেতনার প্রদেশ কেবল স্পর্শ করিয়াছি, ঠিক সেই সময়েই মন আমার এই কাণ্ডটী করিয়া বসিয়াছে। গভীর সুষুপ্তিটা সে যেন অতিকষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিয়াছে কখন আমার ঘুম ভাঙ্গে। তাই তার তর সহে নাই, জাগামাত্রই আমাকে বলিয়া বসিল—সময় যে যায়!

চমকাইয়া উঠিলাম।

বুদ্ধি দিয়া ব্যাপারটা বুঝিবার আগেই দেখিলাম যে, বুকের মধ্যে যেখানে আমার মর্ম্মস্থান সেখানে আকস্মিক

আঘাত তীক্ষ্ণ ছুরির মত গিয়া বিদ্যুৎবেগে বিদ্ধ হইয়াছে; মৃত্যুরও একটা ছায়া অসহায় দৃষ্টির উপর দিয়া যেন খেলিয়া গেল, বুকের ধাক্কাটার প্রতিধ্বনিটা নাভির কাছ পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়া তরঙ্গিত হইল। সময়ের সূক্ষ্মতম অংশকে ক্ষণ বলা হয়, সেই একটা ক্ষণের মধ্যেই ব্যাপারটার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্তটুকুই ঘটিয়া গেল।

ভালো করিয়া জাগিলাম। বুকের বেদনাটা সরিয়া গিয়াছে। মনের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, অনুচ্চারিত বাণী তার শুনিলাম—দিন যে যায়!

জেলের গেটে ছয়টা বাজিল ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাথার উপরে জেলের ছাদের প্রকাণ্ড পিতলের ঘণ্টাটাও সিপাহী বাজাইয়া দিল। প্রকাণ্ড জেলের দেয়াল ডিঙ্গাইয়া গিয়া বাহিরেও চারদিকে সে ঘোষণা ঢং-ঢং চীৎকারে জানাইয়া দিল যে, অদ্যকার দিনটীর ভোরের ছয়টা বাজিল। দোতালার বারো খানা ঘরের আটখানা আমরা স্বদেশী বন্দীরা দখল করিয়া মোট শ'দেড়েক বসবাস করিয়া থাকি। সার্জেন্ট ও সিপাহীরা বিকট বুটের আওয়াজ করিতে করিতে ঘুমন্ত আমাদের ভোরের 'গুণতি' কখন শেষ করিয়া গিয়াছে, ঘুমের মধ্যে আজ তা টের পাই নাই। নীচ হইতে নিত্যকার পরিচিত শব্দাদিতে ধূম হইতে অগ্নি অনুমান করিলাম, মানে, কয়েদী-পাহারা-মেট-

সিপাহী-সার্জেন্ট সকলকে লইয়া জেলের আর একটি দিন শুরু হইয়াছে বুঝিলাম। একটা দিনই প্রত্যহ বিরাট কর্মযন্ত্রে আবর্তিত হয়, জেলে একটা দিন হইতে আর একটা দিনকে পৃথক করিবার কোন চিহ্ন নাই।

বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলাম, ডেকচেয়ারটাকে জানালার কাছে টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার জানালাটা পশ্চিমদিকে। নীচে ইয়ার্ডের পাগলা কয়েদীদের ডিঙ্গাইয়া ঘানি-ঘরের পরে জেলের উচ্চ দেয়াল পার করিয়া দৃষ্টিটাকে বড়লাটের বাড়ীর গাছপালা ঘেরা প্রকাণ্ড ময়দানটায় ছাড়িয়া দিলাম। এখন এটা ব্রিটিশ বিমান-বাহিনীর অফিসারদের দখলে। আকাশে আলো আসিলেই খালি গায়ে একে একে এবং দলে দলে তাহারা মাঠে আসিয়া পড়িবে।

সেই নির্জন মাঠের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া দেখিলাম। দেয়ালের ওধারে বড় রাস্তায় একটা লরী দারুণ শব্দ করিয়া পার হইয়া গেল। শব্দের নমুনা হইতে মনে হইল, অতিকায় একটি মিলিটারী লরী। দৃষ্টিটাকে দেখি ইতিমধ্যেই দেয়াল ডিঙ্গাইয়া জেলের মধ্যে গুটাইয়া আনিয়াছি। ঘানি-ঘরের দরজা বন্ধ রহিয়াছে, সাতটার পরে কয়েদীরা আসিয়া জুটিবে। হাসি পাইল, অতটুকু সরিষা চোখে যা মালুম হয় না, তাহাই পিষিয়া তৈল নিষ্কাশন করিয়া ছাড়ে, মানুষ এমনই মারাত্মক চীজ! মানুষও অবশ্য রেহাই পায় না, ঘানি তাকে সরিষা ফুল দেখাইয়া ছাড়ে—তা সে যে শ্রেণীর ঘানিই হউক।

ঘানিঘর ছাড়িয়া উঠানের মধ্যে দৃষ্টিটা আসিয়া পড়িল। নীচের ঘরটায় জন তিরিশেক পাগল কয়েদীর আস্তানা; বর্ত্তমানে তাহাদেরই ভোরের স্নানপর্ব চলিতেছে, ইহার পরে সারি বাঁধিয়া 'লপসী' ভোজনের পালা। প্রথম প্রথম অনভ্যস্ত চোখে বড় বিষম লাগিত, শেষে অভ্যাসে সহজ হইয়া আসিল এবং বুঝিলাম যে, এই তিরিশ জনেরই পরমহংস অবস্থা। ইহারা নগ্ন হইয়া স্নানপর্ব সমাধা করিয়া থাকে, দেখিয়া আর আশ্চর্য হই না। যে কয়টী অতি উচ্চমার্গের তাদের লইয়াই বিপদ; তাহারা উলঙ্গ হইয়া ঐ ইয়ার্ডের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় বা রৌদ্রবৃষ্টিতে লাশের মত পড়িয়া থাকে। জাঙ্গিয়া পরাইয়া নগ্নত্ব দূর করিবার জন্য মাঝে মাঝে কয়েদী, পাহারা মেট বা সিপাহী চেষ্টা যে না করে তা নয় এবং প্রায়ই তাহা বৃথা চেষ্টার অধিক কিছু হয় না। ওদের দেখিয়া দেখিয়া আমার দৃষ্টিও মুক্ত হইয়া গিয়াছে; বুঝিয়াছি যে নগ্নতায় লজ্জিত হওয়া দৃষ্টির কুসংস্কার মাত্র। যার লজ্জা নাই, তার নগ্নতায় লজ্জা জন্মে না, এটা আমি দেখিয়া শিখিয়াছি—শিশু, পাগল, রোগী, মৃত ইত্যাদি তাহার উদাহরণ। আর একটু চেষ্টার অপেক্ষা মাত্র, তাহা হইলেই দৃষ্টি আমার তুরীয় ভূমিতে স্থিত হইবে আশা হইতেছে। তখন ভদ্র নরনারীর উলঙ্গতাও আর আমার চোখে বিসদৃশ বা বিশ্রী লাগিবে না। রুচিকে সওয়াইলেই সে সব সয়। পাগলরা আমাকে তত্ত্বজ্ঞান দিয়াছে, মানে বুঝাইয়া ছাড়িয়াছে

যে, 'এসেছ ন্যাংটা যাইবে ন্যাংটা মাঝখানে কেন গণ্ডগোল!' আমিও মাঝে মাঝে জানালা হইতে বিড়ি সিগারেট ছুঁড়িয়া দেই—গুরুদক্ষিণা না দিলে বিদ্যা নিস্ফলা হইবার ভয় আছে যে!

দৃষ্টিটা এতক্ষণে নিজের উপরে ফিরিয়া আসিল, মনের দিকে আড় চোখে চাহিয়া দেখিলাম। যাহা ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই হইল, মনের অনুচ্চারিত বাণী শুনিলাম—সময় যে যায়!

ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলাম। ওর এই ন্যাকামির নিকুচি করিয়া ছাড়িব। হউক না আমার মন, এ রোগ অংকুরেই টিপিয়া মারিতে হইবে। নতুবা শেষে কি ঐ নীচের পাগলাদের দলে নাম লিখাইব! সময়ে সাবধান না হইলে সে আশংকা চৌদ্দ আনা নয়, ষোল আনাই আছে। মাথার ভাল ও মন্দের সীমারেখাটা শুনিতে পাই মোটেই চওড়া নয়, সূক্ষ্মতায় জ্যামিতির লাইনকেও হার মানায়—দৈর্ঘ্যই শুধু আছে, প্রস্থ বা পুরুত্বের কোন বালাই নাই। কি সর্তেই কাঁধে মাথা পাইয়াছি যে বহন করিয়া কোন সুখ হইল না, ভয়েই আধমরা হইয়া রহিলাম। বুঝিনা আমাদের এত বাবুয়ানার কি দরকার ছিল, মাথার বদলে জনপ্রতি একটা মুণ্ডু হইলেই তো বেশ চলিয়া যাইত। কিন্তু সে সুবিধা যখন হয় নাই, তখন আপদ গোড়াতেই চুকাইয়া ফেলা ভালো।—এবার আড়চোখে নয় সোজা ভাবেই মনের

দিকে চাহিলাম। হাঁ, কোন ভুলই নাই, সেই একই কথা, সেই অনুচ্চারিত বাণী—সময় যে যায়!

মারমুখী হইয়া উঠিলাম, যেমন কুকুর তেমন মুগুর হইয়া মনকে তাড়া করিলাম।—সময় যে যায়! তা কি করিতে হইবে শুনি? নিষেধ করিতে হইবে? নিষেধ করিলে শুনিবে কেন, কি গরজ তার? কারো ক্রীত চাকর তো সে নয়! আচ্ছা, ভালো মুখেই জিজ্ঞাসা করি,—সময় যাইবে না তো কি করিবে? এ ছাড়া এর কি কাজ আছে বলিতে পার? যাওয়া, কেবল যাওয়া, সামান্য এটুকু কাজই তো সময়ের উপর ন্যস্ত আছে জানি। সাধ্য থাকে থামিয়া দাঁড়াক দেখি! ট্যাফোঁ করিবে, যাইবে না চলিবে না বলিয়া বজ্জাত ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইবে, তামাম সৃষ্টিটা একবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া তারপর বল, তেমন পিতার পুত্র সৃষ্টিতে কেহ আছে কিনা। সৃষ্টিটা মাতুলালয়ও নয়, জমিদারিও নয় যে, আবদার করিবে বা খুশীমত যথেচ্ছাচার করিয়া বেড়াইবে। জগৎটা কার কীর্তি তা আমিও জানি না, তুমিও জান না। তবে এইটুকু অতি উত্তমরূপেই জানি যে, এটা তোমার নয়, আমার নয়, রামের নয়, শ্যামের নয়, ইহার নয়, উহার নয়, তাহার বা কাহার কোনো শর্মারই নয়। আকাশের ঐ সূর্য্য হইতে পৃথিবীর ধূলিটী ইস্তক নাসিকায় নিয়মের রজ্জুতে বাঁধা পড়িয়াছে। রজ্জুটী চোখে পড়ে না, হাতে ধরা দেয় না, তাই ভাবিয়াছ যে সৃষ্টিতে সবাই

স্বাধীন, যেন মনের সুখে বেড়াইতে আসিয়াছ। মাথাটা ঠাণ্ডা করিয়া লও, বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে না তখন। নিয়মের অদৃশ্য সুত্রে—স্বভাবও বলিতে পার—সমস্ত কিছুকে গাঁথিয়া লইয়া সৃষ্টিটাকে এই মহাব্যোমে চড়াইয়া ফিরিতেছে, অন্ততঃ এইটুকু আক্কেল তোমার বুদ্ধির হউক। নাকে-দড়ি ছবিটা যদি আত্মসম্মানে লাগে, তবে সংশোধন করিতে আপত্তি নাই। বেশ, ভাবিয়া লও যে, স্বভাব বা নিয়মের অদৃশ্যস্রোতে সমগ্র সৃষ্টি গা ভাসাইয়া দিয়া চলিতেছে—শুধু মনে রাখিও স্রোতটার আদি, মানে কোনো উৎসমুখ, এবং অন্ত, মানে কোনো শেষ মোহানা, দুয়ের কোনোটাই নাই। বলাই বাহুল্য, এই স্রোতটার ডাইনে বাঁয়ে কোন তটভূমিও নাই যে তাঁর গতি নিয়ন্ত্রিত হইবে।

অনেক কড়া কথা বলিয়াছি, তাই সান্ত্বনার সুরে শেষ করিতে ইচ্ছা হইল। দারুণ গ্রীষ্মের পরেই বর্ষার ব্যবস্থা আছে, পিতার তর্জনের পরেই আছে মায়ের নিবিড় স্নেহ এবং জেলখানায় আমাদের বেদম লাঠিপেটার পরই আছে ফাটামাথা ভাঙ্গাহাত ইত্যাদির জন্য ব্যাণ্ডেজবাহী সরকারের ডাক্তার। অতএব—মনের মাথায় যেন হাত বুলাইতেছি এমনই ভাবে কহিলাম—নাও, আর মন খারাপ করিওনা। সময় যায়? চিরকালই যাইতেছে, কেহই আপত্তি করে নাই, তুমিও করিও না; মানিয়া লও, শান্তি পাইবে। খোঁচাইয়া ঘা করিলে স্বাস্থ্য টিঁকে না, খাল খনন করিলে কুম্ভীর

আমন্ত্রিত হইয়া আসে এবং সুখে থাকিতে অভ্যাস না করিলে ভূতের কিল অদৃষ্টে জোটে। বেশী জানিতে চাহিও না, তাতে সুখ নাই, আর জানাও যায় না। আর দেখ, নিজেকে কোনো মারাত্মক প্রশ্ন কোনোদিন জিজ্ঞাসা করিও না, তাহাতে অনর্থক আত্মপীড়ন, ফলে আত্মবিভেদ উপস্থিত হয়। সোজা-ভাবে সোজা করিয়া বুঝিয়া যাহা পাও, তাহাই খাঁটি। সময় যায়—জানইতো এ জানা কথা। সংসার মানেই তো নিত্য সরিয়া সরিয়া যাওয়া, জগৎ মানেই তো নিত্য গচ্ছতি। আর সৃষ্টি? তোমাকে অধিক বলিতে হইবে না, তুমি নিজেই ভালো করিয়া জানো যে, যা নিত্য বিসর্জিত হইতেছে তাই সৃষ্টি। সময় যাইবে, আয়ু ব্যয় করিতে করিতে তুমিও যাইবে এবং তাহ্রই যাইতেছ সেই অন্তিম শেষের দিকে। মরিবার আগে মনমরা হইয়া বাঁচা, একি ভালো, না এর কোন অর্থ আছে? সময় যায়, তাই বলিয়া তোমার সুখশান্তিও যাইবে, একি একটা কথা হইল! সময় গেলেও ফুরাইয়া যায় না, কাজ গুছাইয়া লইবার সময় মৃত্যু পর্য্যন্তই পাওয়া যায়, যদি একটু সতর্ক ও সজাগ থাকা।

মনকে কায়দা করিয়া আনিয়াছি, এইপ্রকারই বোধ করিলাম। উঃ, ব্যাটা কি বকুনিই বকাইয়া ছাড়িয়াছে। জীবনধারণ করা দেখিতেছি চাট্টিখানি ব্যাপার নয়! ফুসফুসটার ক্লান্তি দূর করা আবশ্যক, সিগারেটের কৌটার জন্য টেবিলের দিকে হাত বাড়াইতে যাইব—এমন সময়ে 'বেড্-টি' লইয়া কানাই ফাল্তু

আসিয়া দেখা দিল। আঃ—আরামের নিঃশ্বাসটা অগ্রিমই নাসিকাপথে পিছলাইয়া বাহির হইয়া গেল।

পায়ের কাছে চেয়ারটায় কাপ। প্লেট-চামচ-চিনির কৌটা রাখিয়া কেট্‌লি হইতে চা ঢালিয়া কানাই চলিয়া যাইতেছিল, ঘরের আর আর বাবুদের চা দিতে হইবে।

ডাকিয়া বলিলাম—টেবিল থেকে সিগারেট দেশলাই দিয়ে যা দেখি।

কৌটাটা তুলিয়া লইয়া কি খেয়াল হইল, নাড়া দিয়া বলিল, নাই মনে হচ্ছে।

—মনে হয়ে কাজ নেই, খুলে দেখ আছে কিনা। খুলিয়া দেখিয়া যেন বিস্মিত হইল এমনই সুরে বলিল, —হাঁ, আছে দেখছি একটা।

—দেখছ? দাও, ওতেই চলবে।

কৌটা হইতে সিগারেট তুলিয়া আমার হাতে দিল, কৌটাটা কিন্তু কানাই নিজের হাতেই রাখিল। যাইতে যাইতে বলিল—কৌটাটা নিলাম বাবু।

—আচ্ছা।

মনে মনে বলিলাম—হারামজাদা। কৌটা নাড়া দিলে সিগারেট আছে বলিয়া মনে হয় না, খুলিলেই আবিষ্কার হয় যে অন্তত একটা আছে, একেই বলে 'বি'-ক্লাশ কয়েদী। চেনানো অসম্ভব, তবু ওদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় গোপাল বাবুর ভাষায়—"ব্যাটারা আমাদের এক হাটে কিনে' আর এক

হাটে বেচতে পারে। সাবধানে থাকবেন। যাকে জিজ্ঞেস করি, সেই নির্দোষী, কিন্তু চাপ দিলেই বেরিয়ে পড়ে, নিতান্ত যে কম এসেছে সেও অন্ততঃ পাঁচ বা'র। বা'র আর জেল, তাঁতের মাকুর মত জীবনটায় টানা পোড়েন দিয়ে যাচ্ছে। সবাই ওস্তাদ গুণীলোক, সাবধানে থাকবেন, বেশী ঘাঁটাবেন না।"—কৌটাটায় যে আরও একটা সিগারেট ছিল, সে-সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত। কিন্তু দেখিয়া ও ঠেকিয়া শিখিয়াছি, তাই বোকাই হইয়া থাকি, বুদ্ধিমান হইয়া আর ঠকিনা। যাঁরা বেশি বুদ্ধিমান হইতে গিয়াছিলেন, বুদ্ধির জন্য নিজেদের দামী আলোয়ান, পেন, ঘড়ি জরিমানা দিয়া ঠাণ্ডা মারিয়াছেন। সিপাহীদের হাত দিয়া সে বস্তুগুলি বাহিরে গিয়াছে এবং চরস-গাঁজা ইত্যাদি মাদক দ্রব্য হইয়া এইসব গুণী ওস্তাদের হাতেই ফিরিয়া আসিয়াছে। এদের কীর্ত্তি ও ক্ষমতা দুইই বিচিত্র এবং মাঝে মাঝে ভয়ংকরও। এরা না পারে এমন কাজ সত্যই নাই।

চায়ে এক চুমুক দিয়া সিগারেটটা ধরাইয়া সবেমাত্র একটী টান দিয়াছি, এমন সময়ে ওধারের কোনার সীট হইতে পরেশবাবুর উচ্চগলা শোনা গেল,—বলিস কিরে, একেবারে খালি? দে দেখি।

কি তিনি দেখিলেন তিনিই জানেন। পরমুহূর্তেই শোনা গেল —একেবারে চেঁচেপুঁছে নিয়েছ বাবা, এক চামচও রাখনি' দেখছি। যাও, এখন চা দিচ্ছ দাও গে, সব কটাকেই আজ তাড়াব।

কিছুটা বুঝিলাম। ঘরের কাজের জন্য কানাই ও আর দুইটী ফালতু আছে, তাড়াইবার ইচ্ছাটা তাহাদের সম্বন্ধেই। কিন্তু কেন? কিছুপরেই পরেশবাবুর জুতার ও গলার শব্দ নিকটে শোনা গেল—"কুম্ভকর্ণদের নিদ্রা এখনও ভাঙ্গেনি। ভাগ্যে জেলে এসেছিলে, চুটিয়ে নবাবী করে গেলে সব।"

ছয়টার চা-টা কম লোকেই খান, সেই টিফিনের সময়েই ওটা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কাজেই প্রায় সীটেই মশারির নীচে কুম্ভকর্ণদলের উক্ত নবাবী, মানে নিদ্রা চলিতেছিল। পর্দা ঠেলিয়া পরেশবাবু আমার সীটে আসিলেন—হাতে চায়ের পেয়ালা ও চামচ।

বলিলাম—আসুন। ফুরিয়ে গেছে বুঝি? নিন, বলিয়া চিনির কৌটাটা ঠেলিয়া দিলাম।

কহিলেন—যাবে না? পাই তো সেই তিন ছটাক, তিন দিনেই ফতুর। এখন বাকী চারদিন কি যে করি—চুরিই করতে হবে শেষটা দেখছি। কৌটাটা বাক্সে সরিয়ে রাখবেন।

উপদেশ দিয়া ও কাজ সারিয়া পেয়ালায় চামচে ঠুন ঠুন শব্দ করিতে করিতে পরেশবাবু বাহির হইয়া গেলেন। পর্দার বাইরে যাইতেই তাঁর উচ্চ গলার গান শোনা গেল,—'চিনি চিনিগো তোমারে চিনি·········ওগো বিদেশিনী।' কয়েকটা সীট হইতে হাসির শব্দ উঠিল। কিন্তু গায়ক এ-হাসিকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না, 'চিনি চিনিগো তোমারে চিনি' চেঁচাইয়া নিজ সীটে গিয়া শেষে থামিলেন।

চিনির প্রসঙ্গে নেপাল বাবুর কথা মনে পড়িল। নেপাল-বাবু বয়স্ক লোক, দৈনিক পত্রিকা অফিসে সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিতেন। একদিন 'ফ্যামিলি-ইণ্টারভিউ' সারিয়া আসিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন—ওহে বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে বুঝে সুঝে কথা বোলো। নইলে ফ্যাসাদে পড়বে।

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন, কি হয়েছে? বৌদির পাল্লায় পড়েছিলেন বুঝি।

—বৌদি কি বল্‌ছ, বাঘিনী বল। কি ভয়ংকর মেয়েমানুষ বাবা! আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে।

শিক্ষাটা এই—

স্বামীর চায়ের নেশা যে কি প্রকার, স্ত্রী তা জানিতেন। তাই আলাপ আলোচনার মাঝে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করেন—চা পাওতো? না খুব কষ্ট হচ্ছে?

নেপালবাবু ভাই, বোন, মেয়ে ও স্ত্রীকে চমক লাগাইয়া দিবার জন্য বুক ফুলাইয়া বলিয়া ফেলিলেন—পাই মানে? সাত কাপের কম একদিনও না।

স্ত্রী চক্ষু দুইটিকে কোটর হইতে এক হেঁচ্‌কাটানে প্রায় ভুরুর উপর তুলিয়া লইয়া বলিলেন—সাত কা-প! চিনি পাও কোথায়?

নেপালবাবু হোঁচট্ খাইলেন, ঢোক গিলিয়া কোনমতে অপরাধীর গলায় বলিলেন,—সপ্তাহে তিন ছটাক চিনি পাই, আমি অন্যের কাছ থেকেও পাই।

—আর এদিকে আমরা গুড়ও পাই না। আছো বেশ।

—নেপালবাবুর ভাই বোন দুজনেই কলেজে পড়ে, কন্যাটি ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ে, তাদের পানে তিনি বোকার মত চাহিয়া রহিলেন। মানে, স্ত্রীর ভয়ংকর দৃষ্টি হইতে তিনি নিজের চোখ দুটাকে সরাইয়া লইলেন।

কন্যাটি মাকে বক্রোক্তি করিল—বল না আমাদের কিছু চিনি ভেতর থেকে আনিয়ে দিক।

মাতা বক্রকে সোজা করিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—বলব আবার কি! আক্কেল থাকলে বলতে হবে কেন, বুঝতে পারে না? জেলে পালিয়ে এসে আছেন খুব আরামে, আর এদিকে আমরা যাই!

গৃহিণী কি ভাবিলেন, আক্রমণের মোড়টা ফিরাইয়া দিলেন। বলিলেন—আচ্ছা বলতে পার তোমাদের দেশি মন্ত্রিদের গায়ে মানুষের চামড়া না আর কিছু?

নেপালবাবুর ইচ্ছা হইল একটু রসিকতা করেন, কিন্তু সাহসে কুলাইল না। শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

—কেন আবার কি? চাউল টেনে নিয়ে গুদামজাত করলেন, লোকগুলো না খেয়ে পোকামাকড়ের মত মরল—সে দৃশ্য যদি চোখে দেখতে। শেষে হাজার হাজার বস্তা চাল নদীর গর্ভে গেল। এখন আবার কাপড় নিয়ে পড়েছে।

বাকীটা ছোটভ্রাতা যোগ করিল—সাতদিন ঘুরে শাড়ী পেয়েছি, তাও একখানা।

স্ত্রী কহিলেন—সাহেবদের কথা ছেড়ে দাও, বিদেশি লোক। তাদের মাথা ব্যথা হবে না জানি। কিন্তু তোমাদের মন্ত্রীরা, তাঁরা এদেশের লোক না কি? পরে শুনবো চালের মত লাটকে-লাট কাপড় উঁইয়ের গর্তে গেছে। মাথায় বাজও পড়ে না, বলিয়া স্বামীর দিকে এমন ভাবে চাহিলেন যে, নেপালবাবু মাথায় হাত বুলাইয়া ফেলিলেন। না, বাজ তার মাথায় পড়ার প্রার্থনা সত্যই গৃহিণী করেন নাই। জীবন-ধারণের সর্ববিধ দ্রব্যাদি শুধু যে অসম্ভব রকমের দুর্মূল্যই হইয়াছে তা নয়, একেবারে দুষ্প্রাপ্যই হইয়া উঠিয়াছে। অথচ, জিনিস-পত্র যে না আছে তা নয়। দুঃখে কষ্টে গৃহিণীর চোখের দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বর ঐ রকম হইলে দোষের নয়। সত্যই কি আর স্ত্রী স্বামীর মাথায় বাজ পড়ার জন্য সুপারিশ করিতে পারেন! মাথায় হাত বুলাইয়া নেপালবাবু আশ্বস্ত হইলেন।

বোন জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা কাপড় পাও তো?

নেপালবাবুর ইচ্ছা হইল বোনের গালে কষিয়া এক চড় লাগাইয়া দেন। বৌদিকে সাপ বাহির করিবার আর একটা সুযোগ দিবার জন্য এই কেঁচো খুঁড়িবার শয়তানি। কলেজে পড়িয়া আর কিছু না হউক নিরীহ মানুষকে বিপদে ফেলিবার বিদ্যাটুকু বেশ আয়ত্ত হইয়াছে।

ভয়ে ভয়ে জবাব দিলেন—পাই।

গৃহিনী জানিতে চাহিলেন—ক'খানা করে পাও ?

সারিয়াছে, যাহা আশংকা করিয়াছিলেন, তাহারই সূচনা হয় দেখি।

কহিলেন—পাঁচখানা করে। ছু' মাস পরে তা ফেরৎ দিতে হয়, তখন আবার পাঁচখানা পাই।

মেয়ে জানিতে চাহিল,—ইচ্ছা করলে তোমরা শাড়ী নিতে পার ?

মা মেয়েকে অনুচ্চস্বরে ধমক দিলেন,—দিন দিন মেয়ের বুদ্ধি যা হচ্ছে, মুখে লাগাম নেই। আবার হাসিস কোন আক্কেলে শুনি ?

নেপালবাবুর ইচ্ছা হইল মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করেন। মায়েদের শায়েস্তা করিবার জন্য মেয়েদের পাঠাইয়া থাকেন, পিতার কৃতজ্ঞতা মনে মনেই ভগবানকে তিনি জানাইলেন। হাসিলে পাছে আবার আক্কেল থাকা-না-থাকার কথা উঠে পড়ে, তাই উদ্গত হাসিটাকে চাপিয়া মেয়ের প্রশ্নের জবাব দিলেন—আমরা শাড়ী পাব কিরে ? তবে, মেয়ে বন্দীরা পান।

ভাই জানিতে চাহিল—বৌদি, আসবে নাকি জেলে ? কি রকম সুবিধা শুনলে তো।

দেবরের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন—শুনলাম তো। কে জানে, শেষটা হয়তো তাই করতে হবে।

বোন প্রশ্নটা সমর্থন করিয়া বলিল—তিনজনে যদি আসি, তবে পনরখানা শাড়ী। আচ্ছা দাদা, পাওয়া হলেই ছেড়ে দেবে নিশ্চয় ?

দাদার বদলে বৌদিই উত্তর দিয়া ফেলিলেন—তা আর দেবে না, তোমার শ্বশুর ঘর যে।—

তারপরে কণ্ঠে গোপনতা আনিয়া স্বামীকে বলিলেন—তোমাকে একটা কথা বলি, বলিয়াই অদূরে উপবিষ্ট পুলিশের কর্মচারীর কান বাঁচাইবার জন্য স্বামীর অভিমুখে একটু ঝুঁকিয়া লইলেন—খোকাকে, মিনুকে বারণ করে দেও, এত ঘোরাঘুরি ভালো নয়। 'জনযুদ্ধের' দল স্কুল কলেজ ছেয়ে ফেলেছে, গোয়েন্দার চেয়ে মারাত্মক, কত লোককে যে ধরিয়ে দিয়েছে, চাকুরী খেয়েছে। ওদের নিয়ে আমি কি যে করি, কথা শোনে না। কোনদিন ধরিয়ে দেয়, তুমি একটু ভালো করে বারণ করে দেও।

নেপালবাবু ভাই ও বোনকে গৃহিনীর আদেশমত ভালো করিয়া বারণ করিয়া দিলেন। এবং বলিতে বলিতে সাহস বোধ হয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকিবে, তাই পত্নীকেও বারণ করিলেন—তুমি যেন আবার শাড়ীর লোভে জেলে এসে পড়োনা। এলে ছাড়াও পাবেনা, আর আমাদের এক সঙ্গে থাকতে দেবে, তাও মনে করোনা।

স্ত্রী আড়চোখে ওদের দিকে একবার চাহিয়া পরে কহিলেন, —থামো, হয়েছে। বয়স যত বাড়ছে, আক্কেলও তত বাড়ছে।

বিস্তারিত জানাইয়া নেপালবাবু আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন বুঝিয়া সুঝিয়া কথা বলিতে। চিনি, চাউল, কাপড়, কয়লা, লবণ ইত্যাদির প্রসঙ্গ উঠিলে যেন আমরা ধ্যানীবুদ্ধের মূর্ত্তি হইয়া বসিয়া থাকি। পরিবার শুদ্ধ জেলে আসায় যার আপত্তি নাই, তেমন দুঃসাহসীর কথা অবশ্য আলাদা, ইচ্ছা হইলে তারা নিজের পায়ে কুড়ুল মারিতে পারেন, তাতে তাঁদের কিছু বলিবার নাই।

ভোরের কৃত্যাদি সারিয়া আসিয়াছি নীচ হইতে। স্নানটাও সঙ্গে সঙ্গে করিয়া লইয়াছি, পরে স্নানের ঘরে কণ্ট্রোলের ভিড় হয়, অনর্থক অপেক্ষা করিতে সময় বেশ খানিকটা বাজে খরচ হইয়া যায়। ডেক-চেয়ারেই আসিয়া আসন লইয়াছি। জেলের কর্মের চাকা পুরা দমে সুরু হইয়া গিয়াছে—ঘানি-ঘরের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, এক এক জোড়া কয়েদী এক একটা ঘানির চারিপাশে চক্র-আবর্ত্তনে দৌড়াইয়া চলিয়াছে। তৈল নিষ্কাশন বিন্দু বিন্দু চলিতেছে, ঘানি ও ঘানির বলদ উভয়েরই। বাদ পড়িল শুধু মালিক।

অসহ্য! ঘানি যন্ত্রের ব্যবস্থা নয়, নিজের ভিতরকার অবস্থা। মনের যন্ত্রে কে এমন মর্মান্তিক মোচড় দিতেছে, নিংড়াইয়া

কি রস বাহির করিতে চায়! বিন্দু বিন্দু বারিপাতের মত প্রাণপাত্রটাই ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। জীবনমৃত্যুর প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি। প্রশ্নটার মুখের দিকে চাহিয়া দেখি—বোবা দৃষ্টি তার। আর, উত্তর? সেও নির্বাক। প্রশ্নের জিজ্ঞাসা-চিহ্নের বঁড়শীগাথা নির্বাক উত্তর স্বয়ং আমি, আছি অসহায়ের মত শূন্যে ঝুলিয়া। আমার গোটা অস্তিত্বকেই একটা সামান্য প্রশ্নের আংটায় আটকাইয়া এমন করিয়া একটানে জীবনের সমস্ত পারিপার্শ্বিক হইতে আল্‌গা করিয়া শূন্যে তুলিয়া লইল! নিজের ভারে নিজেই অবশ হইয়া ক্রমে ক্রমে নির্জীব হইয়া আসিতেছি। এর সঙ্গে আছে নিম্ন হইতে জীবনের আকুল মাধ্যাকর্ষণ। নামাইয়া কোলে ফিরাইয়া লইবার কি উন্মাদ ব্যাকুলতা, কি বিপুল উদ্বাহু আসক্তি। জীবন জানে, কিন্তু মানিতে চাহে না তার চেয়েও প্রবল শক্তি বিদ্যমান। অবুঝ এই জীবন, এত হারাইয়াও হারিতে চায় না।

অসহ্য! বাঁচিবার পথ নাই। দয়া করিয়া যদি প্রশ্নমুক্ত করিয়া শূন্য হইতে জীবনভূমিতে নামাইয়া দেয়, পরম অনুগ্রহ সন্দেহ নাই। কিন্তু নৌকার হাল কাড়িয়া লইয়া স্রোতের আবর্তের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়ার মতই তা নিষ্ঠুর ও জঘন্য দয়া। ও-ভাবে পুরাণা জীবনে আর ফিরিয়া আসা যাইবেনা, কোন নূতন জীবনও সঙ্গে আনা যাইবেনা। তার ছিঁড়িয়া গেলে সেতারের যে বাঁচা তাহাই তখন বিধিলিপি হইবে। সেতার

তার পরাইবে সে শক্তি সেতারের নাই। হাঁ, যদি কোনো গুণীর করস্পর্শ আসে,—কিন্তু দৈব তেমন দাক্ষিণ্য দেখাইবে কি? না, শেষ চেষ্টা করিতে হইবে—মরার আগে মরিতে আমি রাজী নই।

সময় যে যায়—একথা মনে হইল কেন? হাসি ঠাট্টায় উড়াইবার উপায় নাই। শুনি নাই বলিলে চলে না। বোঝা-পড়া, যত কঠিনই হউক, আমাকে করিতেই হইবে। আত্ম-রক্ষার প্রশ্নই আমার। তাই, নিজেকে জানা আমার প্রয়োজন হইয়াছে। নিজেকে না জানিলে নিজেকে রক্ষা করিব কেমনে? নিজে কি চাই, মানে আমার সমগ্র অস্তিত্বের কি কামনা, জানিয়া লইতে হইবে। চাওয়াটা জানি না, তবু চেষ্টা চলিবে, প্রাণক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে, এমন অভিশাপ আর বহন করিব না। কারণ, তা করা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এটুকু আমি বুঝিয়াছি। নানা আশা আকাংখায় নানাভাবে নানাস্থানে, মন আমার আর দশজনের মতই ছড়াইয়া আছে, জড়াইয়া আছে। অন্তত একবার সেই ছড়ানো মনকে কাছে আমার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। সেই সংহত কেন্দ্রস্থ মনকে আমি একবার যদি ব্যবহার করতে পারি, তবে আমাকে হয়তো বুঝিতে পারিব। কি তার সত্যিকার কামনা তাও জানিতে পারিব। জলে-ডোবা মানুষ নাকি ক্ষণমাত্রে তার সমস্ত অতীত জীবনটাকে দেখিতে পায়। তেমন ক্ষণটী যদি আয়ত্তে একবার পাইতাম—

আমি, সমরগুপ্ত নামধারী মানুষটা, প্রায় উনত্রিশ বছর পূর্বে তোমাদের এই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছি। নামটা সঙ্গে করিয়া আনি নাই, আসিয়া পাইয়াছি—যেমন পিতা-মাতা ও আরও অনেক কিছু পাইয়াছি। অবতীর্ণ হইয়াছি, তবে ভূ-ভার হরণ করিতে নয়। ও-ভার হরণ করা যায় না, অবতারেও পারেন না। পাপী ও পাষণ্ডের সংখ্যা কমাইলেই পৃথিবীর ভার কমে না—তবে ঢেউ পিষিয়া সমুদ্রের শরীর হালকা করা যাইত। উত্তাল ও শান্ত সমুদ্রের পার্থক্য শুধু রূপে, কিন্তু রূপ পরিবর্ত্তনে স্বরূপ পরিবর্তন কোনদিনই হয় না। তবে ভার বাড়াইতে আসিয়াছি? না, সে অহংকারও আমার নাই। মুহূর্ত্তের পরমায়ু লইয়া যে বুদবুদ জাগে, তার ভারে সমুদ্র পীড়িত হয় না। তা ছাড়া পৃথিবী তো ভার বোধ করে না, বহনও করে না। মহাশূন্যের কোলে রহিয়াছে—শূন্য এমনি মাতৃক্রোড় যেখানে কোটি সৌরজগতও ভর চাপাইতে পারে না।

তবে আসিয়াছি কেন? জানি না তো! আসিবার আগে জানিতাম না আসিব। আসিয়া তবে জানিলাম আমি আসিয়াছি। কে পাঠাইল? বলিতে পারিব না। জন্মের আগে কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই, কেহ জিজ্ঞাসাও করে নাই জন্মজগতে যাইতে আমি রাজী কিনা। জন্মের আগে

ছিলাম কিনা ? জানিনা ছিলাম কিনা। তবে এইটুকু বলিতে পারি, আমার জন্ম আমি দেখি নাই। আমার জন্ম থাকিলে দেখিতে হয়তো পাইতাম, মনে হয়। আর কোনো প্রশ্ন থাকে যদি, জিজ্ঞাসিত হউক। নাই ? বেশ, তবে এই দিকের ভাবনাটি মোটামুটি একরকম চুকাইয়া রাখা গেল।

আরম্ভের আগেরটা শেষ হইল। শেষের পরেরটাও এইরকম হইবে। অর্থাৎ, জন্মপূর্ব অধ্যায়টার মত মৃত্যোত্তর অধ্যায়টাও একই কালিতে লেখা। প্রশ্ন করিলেই বলিব, —জানিনা, পড়িতে পারি না।

আমি সমরগুপ্ত উনত্রিশ বছর এই মনকে লইয়াই ঘর করিয়া আসিয়াছি। ঝগড়াঝাঁটি যে না হইয়াছে, তা নয়। সুখও দিয়াছে দুঃখও দিয়াছে—কিন্তু মনের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয় নাই ; আমিও ছাড়ি নাই। সে ও না। মনকে আমি মোটামুটি বুঝিয়া নিয়াছি। আজ যে প্রশ্ন সে করিল, তার স্বভাবের কোথাও তো এই ধরনের প্রশ্ন থাকার কথা নহে। তবে আসিল কোথা হইতে, এবং কেন ? এতদিনকার পরিচিত মন আজ এমন অপরিচিতের মত ব্যবহার করিল কেন ?

এবার জেলে আসিয়াছি আড়াই বছর হইল। আড়াই বছরে যতগুলি দিন হয়, একটী একটী করিয়াই পার হইয়াছি উত্থান ও পতনের বন্ধুর পথ ধরিয়া। ঘটনা বহু ঘটিয়াছে, প্রচণ্ড আঘাত যে না পাইয়াছি তাও নয়, কিন্তু মন আমার স্বভাবচ্যুত হয় নাই। তা ছাড়া জীবনে আঘাত আসিবে না, ব্যথা পাইব না, ধূলাবালি লাগিবে না, এমন আবদার চলে না এবং আমি করিও না। এমন কি, মন আমার এই জাতীয় জীবনেই আনন্দ পাইয়া আসিয়াছে এতকাল। খেলোয়াড়ের মনোবৃত্তিই আমার। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতেই জীবনের খেলাটা জমে, তাতেই রুচি ও আসক্তি মনের ছিল। তাই, জেলের জীবনে এমন কিছু ঘটে নাই বা ঘটিতে পারে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস যাতে মন আমার এমন অসহিষ্ণু হইয়াছে। না, তাও নয়। তবে কেন এমন হইল? সময় যে যায়—কেন একথা মনে আসিল? কোথা হইতেই বা এ অভিশাপ মন্ত্র সে সংগ্রহ করিল?

তবে জেল জীবনের মধ্যে নয়, অন্যত্র। বাহিরে খুঁজিলে চলিবে না, তাতে সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ডশ্রম হইবে। আমারই মনের মধ্যে বা স্বভাবের মধ্যে কারণটার অনুসন্ধান আবশ্যক। নিজের মনকে সম্পূর্ণ জানা অসম্ভব, অনেকেই বলেন। হয়তো কথাটা ঠিক। কিন্তু উপায় নাই, অসম্ভব হইলেও আমাকে শেষ চেষ্টা করিতে হইবে। যদি তেমনি হয়, তখন আমিও

নয় বলিব—মনকে জানিতে চেষ্টা করিও না, ওকে জানা যায় না।

সময় যায়—এই ধরণের কথা ও ভাব যাঁদের আসে তাঁদের খবর আমরা জানি। 'বাবা, বেলা যে যায়', বালিকা কন্যার মুখে এই কথা শুনিয়া এক ধনকুবের সংসারই ছাড়িয়া গেলেন। মৃতদেহ দেখিয়া রাজপুত্র শাক্যসিংহের নাকি চমক লাগিয়াছিল—এঁ্যা, মানুষ মরে! সংসারটাকে দুঃখময় বলিয়া তিনি বোধ করিলেন এবং দুঃখ দূর করার জন্য বোধি লাভ করিয়া বুদ্ধদেব হইয়া গেলেন। অতীতেও ছিল, এখন ও আছে, এমন উদাহরণের কোন কালেই সংসারে অপ্রতুল হয় না। সংসার ছাড়িয়া সংসারের অতীত কিছুর জন্য তাঁরা ক্ষিপ্ত হন।

সেই রকম ভয়াবহ সম্ভাবনা দেখা দিল কি? প্রশ্নটা পরিষ্কার করিয়া লই। আমি কি ভিতরে ভিতরে বৈরাগী? সংসারে বীতরাগ হওয়া কি আমার স্বভাব? সোজাই জিজ্ঞাসা করা ভালো—ভিতরে কোথাও কি সন্ন্যাসী গোপন রহিয়াছে, সময় আসিলেই সংসার ত্যাগ করিয়া যাইবে? সময় যে যায়—এ কি সেই মনের গোপন গুহাবাসী সন্ন্যাসীর প্রথম মন্ত্রোচ্চারণ? কেহ সংসারত্যাগ করিয়াছে শুনিলে আমি অসম্ভব রকম ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হইয়া উঠি। স্কুলজীবন হইতেই এই স্বভাব। চুরি করিয়াছে, ঘরে আগুন দিয়াছে, খুন করিয়াছে, মেয়ে মানুষকে ঘরের বাহির করিয়াছে, এই শ্রেণীর খবর পাইলে আমি কোনোদিন এমন বিচলিত হই নাই। একাজগুলি ভালো আমিও

বলি না, সমর্থনও করি না, কিন্তু মন আমার ইহাতে বিচলিত হয় না, ইহাই শুধু জানি। বোধ হয় ইহাকে স্বাভাবিক বলিয়া আমার মন মানিয়া থাকিবে; যত কুৎসিৎ জঘন্য ও ক্ষতিকারকই হউক। সব ঘটনা প্রভাব ও প্রকৃতিতেই প্রশ্রয় পায় ও পুষ্ট হয়। মোটকথা,—ইহাই সংসার, ইহাই জীবন।

কিন্তু, সন্ন্যাসী? সংসারত্যাগী বৈরাগী?—শোনামাত্র মাথায় আমার রক্ত চড়িয়া বসে। কেন এরকম হয় আমি জানিনা। এই আক্রোশ ও বৈরীভাব আমার রক্তের মধ্যে মিশানো, এই স্বভাব আমি লইয়াই জন্মিয়াছি। যুক্তিতর্ক দিতে আমি পারিব না। আমি জানি বৈরাগ্যের নামে ক্রোধে অনেক সময় আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকেনা। ঈশ্বর আছেন কি নাই, এ লইয়া আমি বাক্‌বিতণ্ডা করি না। আমি আমার মত করিয়া বুঝিয়া লইয়াছি, তিনি আছেন। কেন আছেন, কি ভাবে আছেন, থাকিলে সৃষ্টির সঙ্গে কি সম্বন্ধে যুক্ত আছেন, এত দুঃখকষ্ট কেন ইত্যাদি প্রশ্ন আমি নিজেকেও করিনা, অপরে করিলেও কান দেই না।

কিন্তু এই যে একশ্রেণীর মানুষ সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরের জন্য বা শান্তির জন্য,—ধৃষ্টতার মতই আমার কাছে লাগে। যেন আমার মুখের উপর জানাইয়া দিতে চায় যে, আমার জীবনে ধিক্, এই আমার সংসারে কামনা-লালসায় পংকিল পূতিগন্ধময় নরকে আমরা ক্রিমির মত পরমসুখে

কিলবিল করিতেছি। শুধু এইটুকুই নয়, করুণায় বিগলিত হইয়া উপদেশও দিয়া থাকে অনেকে, অনেকে আমাদের দুর্গতির জন্য কাঁদিয়া প্রার্থনাও করে 'পিতঃ, এই অবোধদের ক্ষমা কর।' পিতার ক্ষমার প্রয়োজন তোমাদেরই, আমার নয়। ঈশ্বরকে আমি দেখি নাই, না দেখিয়াও জানি যে, তোমাদের মত এক একজন সন্তানের ব্যবহারে যত ব্যথা তিনি পাইয়া থাকেন, তার শতাংশ ব্যথা আমরা অগণিত ক্রিমির দলও তাঁকে দিতে পারি না। বুদ্ধ, চৈতন্য এরা শুনিতে পাই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। পত্নী-পুত্র ও সংসার ত্যাগ করিয়া আসার জন্য সেই ঈশ্বরের কাছে কাঁদিয়া চোখের জলে ক্ষমা প্রার্থনা তাঁদের করিতে হইয়াছিল কিনা, একথা কেন তোমাদের মহামানবেরা গোপন করিয়া গেলেন? লজ্জায়? এ কি ধরনের লজ্জা! অথচ জুতা মারিয়া গরুদান করিতে লজ্জা তাঁদের হয় নাই, পৃথিবীকে শান্তি ও আচণ্ডালে প্রেম দিতে জনসমাজেই ফিরিয়া আসিলেন। প্রায়শ্চিত্ত যদি করিয়াই গেলেন, সোজা সরলভাবে সেটুকু স্বীকার করিতে কি দোষ ছিল?

ঈশ্বরকে দেখি নাই, তাঁকে চিনি না, জানি না। তিনি আছেন, এটুকুই বিশ্বাস করি, পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁর কাছে এমন অপরাধ করি নাই, তাঁর পাকা ধানে মইও দেই নাই যে, ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সংসার নামক নরকে ডুবাইয়া প্রতিশোধ লইবেন। মুখে বলিবে, 'সত্যের আনন্দরূপ এ-ধূলায় নিয়েছে

মূরতি,' আর ব্যবহারে দেখাইবে যেন দয়ামায়াশূন্য পরম পাষণ্ডের পাল্লায় পড়িয়াছ এই সৃষ্টিতে আসিয়া। ধৃষ্টতারও সীমা থাকে একটা। কে তুমি এমন ঈশ্বর-প্রাপ্ত মহামানব, এত সাহস কোথা হইতে সংগ্রহ করিলে শুনি, যে, ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে ভালোমন্দ সমালোচনা করিতে ভয় পাওনা, দ্বিধা কর না ? তাঁকে বল, ঈশ্বর, বিশ্বের বিধাতা শুনি তোমরাই বল, তাঁর ভয়ে বাতাস বয়, সূর্য্য আলো দেয়, 'মৃত্যু নিজ কর্ত্তব্যে ধাবিত হয়, তিনিই নাকি ভয়েরও ভয়, সমুদ্যত মহৎ বজ্র—অথচ তাঁরই সৃষ্টির ত্রুটি খোঁজ ?, তাঁরই বিধানে গলদ বাহির কর ?

তোমরা নাকি সত্যদ্রষ্টা, তোমাদের 'নয়ন মিথ্যা হেরে না' তোমাদের 'রসনা মিছে না কহে।' 'নারী নরকের দ্বার'—এই চরম মিথ্যা সত্যটি তোমাদের চোখেই কি দেখ নাই, তোমাদের রসনাতেই কি উচ্চারণ কর নাই ? নারীর গর্ভে প্রাণের প্রারম্ভ যার, নারীর স্তন্যে যে-শিশু পুষ্ট, পালিত,—নারীবিদ্বেষী সংসার ত্যাগী হইয়া সেই তোমরাই শেষে হইলে ঋষি, 'ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহামানব ? যদি তাই হয় মনে কর, তবে অভিশাপ দেই আজ এই কারাগৃহ হইতে আমার চরম বেদনার দিনে,—শোন তোমরা ভীরু পলাতকের দল, অতীত ও অনাগতের সমস্ত মুক্ত মহামানব, তোমাদের ঈশ্বর যদি সত্যই থাকিয়া থাকেন তবে এই ধূলার পৃথিবীতে ব্রহ্মনির্বাণ হইতেও তোমাদের স্খলিত হইয়া পড়িতে হইবে, একে একে সকলকেই। স্রষ্টার সৃষ্টির অবমাননা করিয়া

গিয়াছ, প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া মুক্তি তোমাদের নাই। সেই মুক্তি পাইবে মায়ের স্নেহে, পত্নীর প্রেমে, কন্যার সেবায়। হে অভিশপ্ত অথচ ঈশ্বরপ্রাপ্ত বন্ধু, নান্য পন্থা—তোমাদের মুক্তির অন্য পথ নাই।

বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস সম্বন্ধে এই তো আমার মনোভাব। পয়ঃ পানে ভুজঙ্গের কেবল বিষবর্ধনই হয়, বয়ঃ বৃদ্ধিতে আমারও মনের এই বিদ্বেষ-বিষ বাড়িয়া চলিয়াছে। আধ্যাত্মিকতা আমার চরিত্রের ত্রিসীমায় ঘেঁষিতে পারে নাই। বিপ্লবী দলে ঢুকিয়া গীতা পড়িতে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু সুখের কি দুঃখের কথা বলিতে পারি না, গীতা আমার বোধগম্য হয় নাই। বুদ্ধি আমার এই দিকটায় বরাবরই একটু স্থূল; সর্ব-উপনিষদ দোহন করা গীতামৃত, তেমন ভাগ্যবানও নয় সুধীও নয়, তাই বিন্দু মাত্র পান করিতে পারি নাই। গীতার কৃষ্ণকে আমি চিনিনা, বুঝি না। কিন্তু অন্য কৃষ্ণকে আমি চিনি, যিনি বিজন মধ্যাহ্নের বিশ্রামসুখ ত্যাগ করিয়া রাণী রুক্মিনীর শিশু-পুত্রকে কাঁধে লইয়া দ্বারকার প্রাসাদ-অলিন্দে ঘুমপাড়ানো গানের ছন্দে পাদচারণা করেন। গীতার বক্তা পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে আমি যেমন চিনি না, বৃন্দাবনের কৃষ্ণকেও তেমনি আমি চিনি না। বন্ধুর রথের সারথি হইয়া যিনি যুদ্ধের মাঠে ঘোড়ার বল্‌গা হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাঁকেই আমি চিনি। আমার হিন্দুত্বের দৌড় ঐটুকু, আমার ধর্মবোধ ইহার অধিক আর আমাকে আগাইয়া নিতে পারে নাই। নিঃসংকোচে বলিতে পারি,

ধর্মের পথে জিজ্ঞাসু প্রার্থী, আর্ত্ত বা জ্ঞানী কোনোটাই আমি নয়, তাই এ-পথের ভজনা আমি করি নাই।

কিছুক্ষণ যাবৎ কানে আসিতেছিল শীতাংশু সেনের মোটা গলা। গান তিনি বলেন অথবা চীৎকার করেন ; কিন্তু গাহেন এ কথা কেহই বলে না। তবু ঘর হইতে ঘরে সময়ে ও অসময়ে, সেই চলমান গানে,—রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তিনি গান না এবং খদ্দর ছাড়া পরেন না,—সকলে কান খাড়াও কিন্তু করেন। পৃথিবীতে হঠাৎ এক আধটা মুখ চোখে পড়িয়া যায়, কালো খাঁদা-বোঁচা, যেন বিধাতা হেলায় ফেলায় কোন মতে আঙ্গুল টিপিয়া গ. ন শেষ করিয়াছেন, কিন্তু সে মুখে এমন একটু লাবণ্য থাকে যা চোখকে মুগ্ধ আবদ্ধ করিয়া ফেলে। পৃথিবীতে পাঠাইবার সময় বিধাতা গৃহিণী স্বামীর সে অশ্রদ্ধার সৃষ্টি পুতুলটার মুখ আপন আঁচলে হয় তো গোপন স্নেহে মুছাইয়া দিয়া থাকিবেন। তেমন কিছু শীতু বাবুর মোটা ভাঙ্গা গলায় রহিয়াছে, যাতে শ্রবণে শ্রবণাতীত কিছু পাওয়া যায়।. চলমান সঙ্গীতের পিছনে পিছনে শীতুবাবু আমার সীটের দিকেই মোড় ঘুরিলেন। "জানি বন্ধু জানি তোমার আছে তো হাতখানি" এই পর্যন্ত আসিয়া যেন ফুঁ দিয়া গানের প্রদীপটাকে নিবাইয়া দিলেন, পর্দার ওপাশে আসিয়া এবং পর্দাটা ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িলেন—"একাই আছেন দেখছি।"

"আসুন।" বলিয়া সাড়া দিলাম, তখনও কিন্তু কানে গানখানি

লাগিয়াছিল। চিন্তার অন্ধ গহ্বরে তেমনি অন্ধ মন সুরঙ্গ খনন করিয়া পথ খুঁজিতেছিল, কোন্ অজানা বন্ধুর দক্ষিণ হাতখানি ভরসার বিদ্যুৎচমক দিয়া গেল! কিন্তু আমি তো জানি না, তাই ভরসা করিয়া বলিতেও পারি না, "জানি বন্ধু জানি তোমার আছে তো হাতখানি।"

—ইজিচেয়ারে সোজা উঠিয়া বসিলাম। শীতাংশু বাবু বিছানায় উঠিয়া বসিলেন, পা'দুইটী তুলিয়া ভদ্রাসন করিয়া লইলেন। বুঝিলাম, সহজে নিষ্কৃতি দিবেন না, কিছুটা সময় আমার খাবল মারিয়া শেষ করিয়া তবে উঠিবেন।

কহিলাম,—তারপর খবর বলুন।

পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া একটা নিজের মুখে চাপাইলেন, আর দ্বিতীয়টী আমার হাতে দিলেন। সিগারেট চাপা ঠোঁটেই কহিলেন,—কাল আই-বি ইন্টারভিউ গেছে।

—ম্যাচ্ আছে?

ম্যাচ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ছাড়ার কথা কিছু হোল? নিজেরটার মুখাগ্নি করিয়া জ্বলন্ত কাঠিটা দুই হাতের গোলাকৃতি গহ্বরে ঢাকিয়া আগাইয়া দিয়া বলিলেন,—নিন্। পরে কাঠিটা জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিলেন, সিগারেটে ভালো একটী টান দিয়া ধুঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন,—অনেক কথাই হোল।

—কে এসেছিলেন?

—তাতে ত্রুটি নাই, এক রায়সাহেব ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

—কি বল্লেন?

—বল্লেন, ছাড়া—সময় হোলেই পাব, কিন্তু সে সময়টা কবে তা তিনি জানেন না। বোঝেন কেমন? বলিয়া আমাকে বুঝিবার অবকাশ না দিয়া নিজেই হো হো হাসিয়া উঠিলেন। থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—যুদ্ধটা কবে শেষ হবে বলতে পারেন?

—যে কোনো দিন হতে পারে, আবার কয়েক বছরও লাগতে পারে।

যেন হতাশ হইয়া গেলেন, কহিলেন,—খুব উপকার করলেন!

অপরাধীর হাসি লইয়া কহিলাম,—বুঝতেই তো পারেন—।

শেষ করিতে দিলেন না, থামাইয়া দিলেন—থাক, পরিশ্রম করবেন না, বুঝতে পেরেছি। আর এদেরও বলি, যুদ্ধে মরছিস্ মারছিস্, বেশ বুঝলাম। প্রায় ছ'বছর তো দেখলি, নে এখন চুকিয়ে ফেল্, না, শেষ করেঙ্গা। বেশ বাবা, খুব কষে শেষ কর। বলে রাখছি, বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।

হাসিয়া ফেলিলাম,—তাতে আপনার কি? ওদের বংশ, ওরাই সাফ্ করছে,—আপনি কথা বলতে যান কেন?

—যাই নিজের গরজে। নইলে ঝাড়েমূলে শেষ হয়ে গেলেও কে কথা কয়।

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনার আবার কি গরজ পড়ল, তা তো বুঝলাম না।

—তবু ভালো, স্বীকার পেলেন। যুদ্ধটা শেষ না হলে ছাড়া পাব না, সেই পাকা বন্দোবস্তই করে এসেছি।

—মানে ?

—মানে কাল রায়সাহেবের সঙ্গে ফ্যাসাদ চুকিয়ে দিয়ে এসেছি। কার সাধ্য যুদ্ধ শেষ না হ'লে আমাকে খালাস করে। যাক, ভাববেন না,—যাহা বাহান্ন তাহা তেপ্পান্ন।

যেন আমিই সাতিশয় ভাবিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। প্রতিবাদ নিষ্ফল, তাই অন্য প্রশ্ন করিলাম,—কি কথা হল ?

—সে মেলা কথা, ঝাড়া একঘণ্টা প্রেমালাপ। বলে কি না,—যা করেছেন বলে দিন, তবে 'রিলিজের' চেষ্টা দেখতে পারি।—ওরে বেটা, যা জানি তা তোমাকে বলে দেই! কেন, তোমার হুকুমে করেছি যে, তোমাকে বলতে যাবে ? বোঝেন কেমন ?—বলিয়া সেই হো হো হাসি। হাসিতে যোগ না দিলে হয় তো বলিয়া বসিবেন, হাসছেন না যে বড়, এত বেরসিক কবে থেকে হলেন,—তাই আমিও হাসিলাম।

—আর কিছু কথা হল ?

—এর পরেই তো আসল কথা হল। বলল, যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনার মত কি ? বল্লাম, আমার মত, এটা হল যত বাঁদরের কাণ্ড। আমার মত, যারা যুদ্ধে নেমেছে তারা যেন গোষ্ঠিশুদ্ধ নিপাত যায়। যুদ্ধ সম্বন্ধে আমার মত কি, যেন আমার মত নিয়েই এটা বাধিয়ে বসেছেন ? বলি, বোঝেন কেমন ?

এবার কিন্তু হো হো হাসি সশব্দে ফাটিয়া বাহির হইল না, হাসিটা তিনি দুই চোখে নাচাইতে লাগিলেন।

চোখে চোখ পড়িতেই কহিলেন,—আবার জিজ্ঞেস করে— সুভাষ বাবু সম্বন্ধে আমার মনোভাব কি।

আমি নিজে ফরোয়ার্ড ব্লকের লোক, তাই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনি কি বল্লেন ?

—বল্লাম, সুভাষ বাবুর 'পর আমি অসম্ভব চটে গেছি। শুনে রায়সাহেব বল্লেন,—কেন, কেন ? বল্লাম,—কেন আবার কি ? আসতে এত দেরী করছেন কেন ? এলে আপনাদের চেহারাটা কেমন হয় দেখা যেত। বেটা কিন্তু মোটেই দমল না, সাত পুরুষের উপরও বোধ হয় গোলামী রক্ত। এর পরেও বলে কি না, তাঁর জাপানীদের সঙ্গে যোগ দেওয়াটা আপনি কি মনে করেন।

আমি হাসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি মনে করলেন শুনি !

—সোজা মনে করলাম, জাপানী তো জাপানী, যদি সয়তানের সঙ্গেও যোগ দেন সেওবি আচ্ছা, যদি দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি আসেন।—ইহার পরে অদৃশ্য শ্রোতাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—দু'শ বছর হয়ে গেছে, আর না। ঘরের ছেলে এখন ঘরে যাও, কেন মিছে এখানে পড়ে থেকে কষ্ট পাও ! আপনি কি বলেন ?—

আমি বলিলাম,—না পাকা বন্দোবস্তই করে এসেছেন। আমাদেরও ভোগাবেন দেখছি।

—বোঝেন কেমন, বলিয়া এবার যে মৃদু হাসি দিলেন, তাতেই পরম পরিতৃপ্তি প্রকাশে তিনি সক্ষম হইলেন। খুশী

হইয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া একটা আমারও দিকে আগাইয়া দিলেন।

কহিলাম, না থাক, এই তো টানলাম।

কহিলেন,—আরে নিন, মন খারাপ করবেন না। কথায় বলে, জীবন এই আছে এই নাই। কবিতা পড়েন নি,—'নলিনী দল-জল জীবন টলমল।' অত ভাবলে কি চলে—?

ভাবিলে চলে না, তা আমি জানি। তবু ভিতরে ভিতরে অধৈর্য হইয়া উঠিতেছিলাম শীতাংশু বাবু উঠেন না কেন, আর কত সময় নষ্ট করিবেন? মন চায়না, তবু বসিয়া বসিয়া এই আলাপ শুনিতে হইবে।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—শরীর খারাপ নাকি?

চমকাইয়া উঠিলাম, ভিতরের কথাটা মুখে ধরা দিল নাকি! মনের সঙ্গে চোখ মুখের যোগটা ছিন্ন হইয়া গেলে বাঁচি, তবে আর এমন ভাবে ধরা পড়িয়া অপ্রস্তুত হইতে হয় না। তেমন অভিনেতা বা মনোজয়ী যোগী আজও হইয়া উঠিতে পারি নাই।

মুখে বলিলাম, না, শরীর বেশ ভালোই আছে।

শীতুবাবু বৃদ্ধা-পিসিমা-গলায় বলিলেন,—ভালো থাকলেই ভালো। একটু বিমর্ষ দেখা যাচ্ছে, তাই জিজ্ঞেস করলাম। বাড়ীর খবর সব ভালো ত?

কথা বাড়াইয়া লাভ নাই, তাই জবাব দিলাম,—হাঁ ভালো। অথচ বাড়ী বলিতে যা বুঝায়, তেমন কিছু আমার নাই। ভাগ্য এদিকটায় আমাকে রেহাই দিয়াছে।

শীতুবাবু স্বগতভাবেই কহিলেন,—রাত্রে বোধ হয় ভালো ঘুম হয় নাই, তাই ওরকম দেখাচ্ছে। ও কিচ্ছু না, খেয়ে ঘুম দিন।
ভগবান রক্ষা করিলেন, এক মূর্ত্তি আসিয়া দেখা দিল,—শীতু বাবুদের ঘরের ফালতু।
শীতু বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি রে ?
—ধোপা এয়েছে, কাপড় দেবেন না ? বলিয়া নালিশের সুরে যোগ করিল,—সব জায়গায় খুঁজেছি।
শীতু বাবু কহিলেন,—যা, আসছি।
—আবার কোথাও জমে যাবেন না যেন, বলিয়া পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল। ফালতুর গমন পথের দিকে ইঙ্গিত করিয়া শীতুবাবু আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—বোঝেন কেমন ? এই বেটাদের জ্বালায় জেলই ছাড়তে হবে দেখছি, বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে বলিলেন,—যাই। পর্দার বাহিরে গিয়াই সেই নিবানো গানের প্রদীপটা জ্বালাইয়া লইলেন, যেন সেই গানের আলোতে পথ দেখিয়া চলিবেন। ভাঙ্গা মোটা গলার গান উচ্চারিত হইল—'আমার শূন্যতা দেও যদি সুধায় ভরি, যাব তোমার জয়ধ্বনি ঘোষণ করি।'
নিজের মনের দিকে চাহিলাম। প্রকাণ্ড একটা গহ্বর হাঁ করিয়া আছে, সে শুধু শূন্য নয়, অন্ধকারও যে। কেবল সুধায় এ শূন্যতার তৃষ্ণা মিটিবে না, এর গভীরে যে আলোর পিপাসাও রহিয়াছে।

স্বদেশী দলে ঢুকিয়াছি স্কুলে থাকিতেই, বয়স তখন পনর-ষোল হইবে। তারপর হইতে জীবনটা এই খাদেই বহিয়া অসিয়াছে। এক চক্ষু হরিণের মৃত্যু আসিয়াছিল নিতান্ত নিশ্চিন্ত ও নিঃশংক দিক হইতে। আমারও কি তেমন নিশ্চিন্ত ভ্রম হইয়াছে? শ্বাসপ্রশ্বাসের মতই এই বিপ্লবীজীবনটা আমার কাছে সহজ হইয়া গিয়াছে, অতি পরিচয়ে একে গ্রাহ্যের মধ্যে আনি নাই এতক্ষণ। মনের মৃত্যুবাণ কি তবে এই দিক হইতেই আসিল? আমি জানি, তা নয়। তবু প্রদীপের নীচটা দেখিয়া লইব, সত্যই সেখানে অন্ধকার ছিল কিনা।

দেশের স্বাধীনতা আমি চাই, আর দশজনে যেমন চায় তেমনি। সবাই হয়তো এই চাওয়াটার জন্য দাম দিতে পারে না। আবার যাদের প্রবল ইচ্ছা আছে, তারাও হয়তো সংসারের কাছে ছুটি পায় না। সকলেই সৈন্য হইবে, এ কোন দিন হয় না, প্রয়োজনও থাকে না। দেশের স্বাধীনতা চাহিতে পারিলেই সাধারণের কর্ত্তব্য শেষ হয় আমি মনে করি। অবশ্য সেই চাওয়াটা সত্য হওয়া চাই।

মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইবার একটিমাত্র পথই আছে, ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতারও তেমনি একটিমাত্র পথই আছে, ইতিহাস বলে। দ্বিতীয় কোন পথ নাই, সব পথই অবশেষে ঘুরাইয়া সেই একটিমাত্র পথেই যাত্রীদের পৌঁছাইয়া দিয়া থাকে। তা' বিপ্লবের পথ। সে পথ মৃত্যুর পথ, রক্তে কর্দ্দমাক্ত। এতকাল আমরা মরিয়াছি, কিন্তু প্রাণ দেই নাই।

চাকাটা ঘুরাইয়া দিতে পারিলেই দু'শ বছরের ক্লেদাক্ত জঘন্য ইতিহাসেরও গতি পরিবর্ত্তিত হইবে। ইতিহাসের অদৃশ্য এই চাকাটা বিপ্লবের কঠিন মুঠিতে ছাড়া ধরিবার উপায় নাই! অন্য পথ সত্যই নাই।

চাওয়া ও পাওয়া সম্বন্ধে ষোল বছর বয়সে যাহা বুঝিয়াছিলাম, একটা যুগ পার হইয়া আসিয়াও তার অধিক কিছু আর বুঝিলাম না। মত ও পথের হিসাব আমি প্রারম্ভেই চুকাইয়া তবে আরম্ভ করিয়াছি। সোজা ভাবেই বুঝিয়াছি যে, স্বাধীনতা চাই। কেন? এ প্রশ্ন বুদ্ধিমান ও পণ্ডিতদেরই জিজ্ঞাসা করিও। আমি বুদ্ধিমান বা পণ্ডিত কোনটাই নয়, তাছাড়া আমার এ বিষয়ে ধৈর্যও বড় অল্প। আমি কেন বাঁচিতে চাই, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে সে মানুষ সত্যই কি পৃথিবীতে আসিয়াছে? আমি জানি যে, বাঁচিতে দিবে না, পথ আটকাইয়া দাঁড়াইবে, শুধু পশুর মৃত্যুর পথটাই আমার জন্য খোলা রাখিবে। এ তো নূতন কথা নয়, দুই শতাব্দী যাবত তাহাই করিয়া আসিতেছ। তুমিও জান, আমিও জানি, পৃথিবী বিপুলা হইলেও তোমার ও আমার একসঙ্গে বাঁচা চলে না, দুজনের জায়গা এ পৃথিবীতে নাই। এতকাল কেবল আমিই সরিয়া জায়গা ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছি এবং তুমিই একটানা রহিয়া গিয়াছ। তবু আমি বার বার আসি এবং একদিন চরমভাবেই আসিব। সেদিন পার যদি জিজ্ঞাসা করিও, স্বাধীনতা কেন চাহিয়াছিলাম এবং সত্য উত্তর সেদিন সত্যই দিব।

স্বাধীনতার জন্য কি আমি এতই অধীর হইয়াছি যে, ‘সময় যে যায়’ এই ধরণের বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস আজ বাহির হইবে? না, তেমন অধীরতা আমার নাই। মাঝে মাঝে বরং মনে সন্দেহ হয় যে, স্বাধীনতার আকাংখাটাই হয়তো আজ আমার মধ্যে নিঃশেষে লোপ পাইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতা আসিল না, অথচ সময় পার হইয়া যাইতেছে—এ মনোভাব আমার নাই, একথা বলিতে আজ লজ্জা পর্যন্ত বোধ করি না। এই তো আমার মনের অবস্থা!

পাঁচবন্ধু আমরা। বন্ধুদের সঙ্গে আমিও একদিন অধীর—হইয়াছিলাম। সেই অধীরতা দুই বন্ধুর শেষ হইতে পারিয়াছিল আঠারো বছর বয়সেই,—তরুণের সে-উন্মাদনা ইংরাজ সরকারের ফাঁশির দড়িতে ঝুলিয়া সমাপ্ত হইল। ম্লান মুখে পুত্রহারা মায়েদের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছি, বুকে চাপিয়া ধরিয়াছেন, হারানো পুত্রের ঘ্রাণ-স্পর্শ হয়তো তখনও কিছু বা আমার কিশোরদেহে মাখানো ছিল। গোপনে প্রাণ ভরিয়া সেদিন কাঁদিয়াছিলাম। আকাশে বন্ধুদের অদৃশ্য উপস্থিতিকে সম্বোধন করিয়া প্রতিশোধ প্রতিজ্ঞাও মনে মনে উচ্চারণ করিলাম, ‘ধুয়ে মুছে যেতে হবে এ-পাপ এ-লাজ, আজ হতে জীবনের এই শেষ কাজ।’ আমিও যাইব, কিন্তু যাইবার সময়ে শেষ কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া যাইব না। —মিথ্যা বলিতেছি না, মিথ্যা বলিয়া আমার কি-ই বা প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? অধীরই আমি সেদিন হইয়াছিলাম, সত্য শপথই করিয়াছিলাম। বীরের বন্ধু ছিলাম সেদিন!

অধীরতা তার শিখরচূড়া স্পর্শ করিয়াছিল, এর কয়েকমাস পরে। দুই বন্ধু তখন চলিয়া গিয়াছে। গান্ধীর সত্যাগ্রহের বেড়াজালে সরকার আমাদের তিনজনকেও জেলে টানিয়া তুলিয়াছিল কয়েকমাসের জন্য। সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে স্থানাভাব লইয়া জেল কর্তৃপক্ষের একটু গণ্ডগোল বাধিয়াছিল, থামাইয়া ঠাণ্ডা করিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একদিন ভোরবেলা সদলবলে জেলে ঢোকেন। ঢুকিবার সময় গেটেই জেল-সুপারিণ্টেনডেণ্টকে নাকি তিনি সদম্ভে ভরসা দিয়াছিলেন যে, তিনি জার্মানবন্দীদের শায়েস্তা করিয়াছেন, আর এরাতো বাঙ্গালী বাবু। জবরদস্ত ইংরেজই ছিলেন, পরে একটা প্রদেশের গভর্ণর হইয়া বৃদ্ধবয়সে-চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। আসিয়াই জেলগেটের সম্মুখে খোলা জায়গায় বেতমারার তিনঠ্যাংয়ের কাঠের মঞ্চটি খাটাইতে হুকুম দিলেন। পরে আমাদের শ'-খানেককে ওয়ার্ড হইতে পুলিশপ্রহরীদের জিম্মায় খেদাইয়া যথাস্থানে আনিয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড় করাইলেন। কাঠের খাঁচাটি দেখিয়া বুঝিলাম, শাস্তির ব্যবস্থা আগেই হইয়া গিয়াছে, বাকী শুধু বিচারের প্রহসনটা। শুধু জবরদস্ত রাজপুরুষই নন দূরদর্শীও বটে, ভবিষ্যতের পাকা বন্দোবস্ত করিয়া তবে কাজে হাত দিয়াছেন।

আমাদের অদৃষ্টও ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে যোগ দিল। ভাগ্যদেবীর কি গোপন ইঙ্গিত ছিল, বন্ধুদেরই একজনের সম্মুখে আসিয়া ম্যাজিস্ট্রেট দাঁড়াইলেন, কড়া গলায় হুকুম করিলেন, সেলাম দেও।

বন্ধু জানিতে চাহিল,—কেন ?

ম্যাজিষ্ট্রেট ধমক দিয়া উঠিলেন,—সেলাম দেবে কিনা বল ?

প্রশ্ন হইল,—কে তুমি ?

—আমি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট।

—ও, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ? তুমিতো তুমি, সমস্ত ইংরেজ জাত এলেও সেলাম পাবে না।

—দেখেছ ? বলিয়া সম্মুখের বেতমারার খাঁচাটার দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন।

—বেত ? তারপর সামান্য একটু হাসি যেন বন্ধুর মুখে খেলিয়া গেল। বলিল,—বরং তোমার মেশিনগান বেয়নেট নিয়ে এসে চেষ্টা করে দেখতে পার সেলাম আদায় হয় কিনা।

সাহেব গর্জ্জন করিলেন,—অল্‌রাইট, টাঙ্গাও।

পরেরটুকু সংক্ষিপ্ত। বন্ধুকে ধরিয়া লইয়া মঞ্চে তুলিল, গণিয়া গণিয়া পনেরো ঘা বেত মারা হইল। হাত পা কোমর ঐ কাঠের সঙ্গে আগেই আবদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছিল, নড়িবারও উপায় ছিল না। দীর্ঘ ক্ষণার আঘাত একে একে কাটিয়া বসিতে লাগিল, রক্ত ফাটিয়া বাহির হইয়া ক্ষতস্থান ভিজাইয়া দিল।

বেত্রাঘাত শেষ হইলে বন্ধুকে বন্ধন মুক্ত করা হইল, কাপড়টা কোমরে জড়াইয়া বন্ধু আস্তে আস্তে নামিয়া আসিল। সাহেবের সম্মুখে গিয়া মুখোমুখী হইয়া জিজ্ঞসা করিল, মিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, বল তোমার সেলাম পেয়েছ ?—জবরদস্ত ইংরেজ বিনা উত্তরে টুপিটা মাথায় তুলিয়া গম্ভীরমুখে জেল হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বন্ধুকে বাঁধিয়া বেত্রাঘাত করিয়াছে, হাতদশেক দূরে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিয়াছি। অধীর হওয়ার যতটা শক্তি ছিল, আঠারো উনিশ বছরেই সেদিন ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছি। একেবারে নিঃস্ব রিক্ত হইয়া গিয়াছি সেদিন—জীবনের প্রিয়তম বন্ধুকে বাঁধিয়া লইয়া পশুর মত বেত মারিয়াছে, আমি দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি, ইংরেজ আমাকে তা দেখাইয়াছে। সেই বন্ধু আজ এগারো বছর আলিপুর জেলের আবদ্ধ কুটুরীতে দিন যাপন করিতেছে, আরও নয় বছর বাকী আছে তার বাহিরে আসিবার। আমি অধীর হইব কেন? কুড়ি বছর গিয়াছে, চল্লিশ বছরে ফিরিবে। যদি বাঁচিয়া থাকে, বন্ধুকে বুকে একদিন পাইবই —অধীরতার তো কিছুই নাই?

বাকী রহিল একবন্ধু।

সে-ঘটনার পর যেন তার কি একটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সর্বদা বিমর্ষ গম্ভীর, হাসি চাঞ্চল্য সব যেন কে তার মুখ হইতে মুছিয়া লইয়াছে। মাসখানেক পরের ব্যাপার, তখন আমরা মুক্ত। একদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আসিয়া উপস্থিত হইল, কহিল,—চল।

তার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম। মিনিট পনেরো নিঃশব্দে হাঁটিয়া পদ্মার পারে আসিয়া উভয়ে বসিলাম, গায়ে গা লাগাইয়া। যেন অতিপরিশ্রমে কথাটা বাহির করিতেছে, সেই ভাবেই বলিল—তোকে একটা কথা বলার জন্য ডেকেছি—এই আমাদের শেষ দেখা।

চমকাইয়া উঠিলাম,—শেষ দেখা, কি বলিস্ তুই ? কি হয়েছে আমাকে খুলে বল, পাগলামো করিসনে।

—না, পাগলামো নয়। সমর, বিশ্বাস কর, আমি আর থাকতে পারছিনে।

—থাকতে পারছিসনে, কেন কি হয়েছে ? কোথায় যেতে চাস তুই ?

—তা জানিনা। ভিতর থেকে কে যেন কেবলই আমাকে ডাক্‌ছে, আমি পাগল হয়ে গেলাম। আমার খাওয়া গেছে, ঘুম গেছে, শান্তি সোয়াস্তি সব গেছে সমর,—বলিয়া বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল। বুকের মধ্যে আমি যেন কেমনতরো একটা ব্যথা বোধ করিতে লাগিলাম। ওর গলার সুরে, চোখের জলে কি ছিল, ঈশ্বরই জানেন।

একটু সামলাইয়া লইয়া ভাঙ্গা গলায় কহিল,—ওকে বেত মারার পর থেকে এরকম হয়েছে। আমি থাকতে পারব না, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে সমর. না গিয়ে আমার রেহাই নেই। ওর সঙ্গে তো দেখা হোলো না। ভেবেছিলাম, তোর সঙ্গেও দেখা করব না।

আকাশে গভীর প্রশান্তি। সম্মুখে বিস্তীর্ণ পদ্মা এক বুক-ভরা কালোজলের ঢেউ নাচাইয়া অন্ধকারেই চলিয়াছে। সেদিকে চাহিয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুই কি সন্ন্যাসী হবি ?

—তাতো জানি না, তবে আমার সংসারে থাকা হবে না।

কথায় কান না দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুই কি ঈশ্বরের জন্য এসব ছাড়লি ?

—হয়তো তাই। যে আমাকে ডাক দিল, সে ঈশ্বর কিনা জানি না। যদি দেখা পাই, তবে আবার আসব।

পদ্মার অশান্ত তরঙ্গ তটভূমিকে আঘাত করিয়া চলিয়াছে—চল্-চল্-চল্। রাতের এক ঝাঁক পাখী পদ্মার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। তারাভরা আকাশ ঐ দূরে পদ্মার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

কহিলাম,—না, ফিরতে তুই পারবিনে। যে মন নিয়ে যাচ্ছিস, সে মন তোর থাকবে না। ঈশ্বরকে পেলে তোর জ্বালা আক্রোশ সব জুড়িয়ে যাবে, আমাদের দুঃখ বুঝবার মত মন তোর থাকবে না।

শুনিয়া আবার তার চোখে জল আসিয়া পড়িল, আমার হাতটা দুই হাতের মধ্যে লইয়া বলিল,—আমি ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি ফিরে আসব !

চোখে জল আসিতেছিল, চাপিয়া কহিলাম,—কেউ পারেন নি। তোরই মত মন নিয়ে অরবিন্দ গেলেন, ফিরতে আজও পারেন নি !

—আমি তো দিব্যজীবন আনতে যাচ্ছিনে, অতিমানস শক্তির অবতরণের জন্য তপস্যা করতে যাচ্ছিনে, সমর !

—তবে কেন যেতে চাস্ ?

—তোকে ছুঁয়ে বলছি, তোর চেয়ে প্রিয় আমার জীবনে কিছু-

তো নেই,—আমি চাই এই রক্তমাংসের শরীরে ভগবানের ক্রোধ নিয়ে আসতে। তাঁর কাছে আমি চাইব অভিশাপ-অগ্নি। যদি পাই, আমি ফিরে আসব।

জানি, একে রাখা যাইবে না। এও গেল। না মরিয়াও আমার বন্ধুর মৃত্যু হইল। চোখ দিয়া অবাধ্য অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। কহিলাম,—যা, আমি বাধা দেব না। যদি ফিয়ে আসিস্, আর যদি ততদিন বেঁচে থাকি, তবে দেখা হবে। কিন্তু সে আশা নেই।

আমিই তার একমাত্র বাধা ছিলাম, আমিই বাধা সরাইয়া দিলাম। এবার আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, কহিল,—সমর, আমি আসব। এ জন্মে না আসি, পর জন্মে আসব। আমাকে দেখলেই চিনে নিতে পারবি, ঈশ্বরের কাছে এই বর আমি চেয়ে নেব।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। আমার দিক দিয়া কোন সাড়াই পাইল না। এতজল লইয়া পদ্মা চব্বিশ ঘণ্টাই চলিয়াছে, কিন্তু সে জল ফিরিয়া আসে কি? কে জানে, হয়তো মেঘ হইয়া শূন্যপথে তাহাই শৈশবের সেই জন্মশিখরে ফিরিয়া যায়!—বন্ধুর একখানি হাত কাঁধে আসিয়া ন্যস্ত হইল, যেন আপন মনেই কথা কহিতেছে, এমন সুরেই বলিল,—একাই রইলি!

চোখ দুইটাকে ওর দিক হইতে সরাইয়া লইলাম, দৃষ্টি জলে ঝাপসা হইয়া আসিতেছিল।

—জেগে থাকিস্ সমর, তোর কাছে এই আমার শেষ প্রার্থনা।
দীর্ঘশ্বাসে প্রার্থনাটা সে শেষ করিল।

নিজেই তাকে সঙ্গে করিয়া ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। যাইবার আগে সামলাইতে পারে নাই, বলিয়া ফেলিল,—মা রইল, দেখিস।

বেশীদিন দেখিতে হয় নাই। পুত্র কিসের ডাকে সংসার ত্যাগ করিল, ছয় মাস না যাইতেই বিধবা মাতা তার চাইতেও বড় ডাক শুনিয়া পৃথিবীই ত্যাগ করিলেন।

কিশোর বয়স ভালো করিয়া পারও হয় নাই, যৌবনের প্রান্তে পা দিবার আগেই জীবনের উপর দিয়া বিধাতার চাকাটা এমন ভাবে গড়াইয়া মাড়াইয়া গেল। বুকে তো আজ এমন বাসিন্দা নাই, যে অধীর হইবে!

আজ ত্রিশ বছর বয়স হইতে চলিল। স্বাধীনতার কথা আমি প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছি। কেবল মানুষের মুখে চাহিয়া খুঁজি, রুদ্র ভৈরবের পরিচয়-জ্যোতি ললাটে লইয়া কেহ আসিল কিনা! তোমরা বল—কাল যায়, আমি বলি মহাকাল আসেন। আমার বুকে কান পাতিয়া শোন, হৃদ্‌স্পন্দনে তাঁহার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইবে। সময় যায়,—কিন্তু তিনি আসিতেছেন!

স্বাধীনতার জন্য অধীরতার প্রয়োজন আমার মিটিয়া গিয়াছে। অধীর হইবার শক্তিও নাই। জেলে আসার পর শুনিলাম,

গান্ধীজী ঘোষণা করিয়াছেন 'কুইট-ইণ্ডিয়া'—ভারত হইতে সর, 'ডু-অর্-ডাই'—কর কিংবা মর। চমকিত হইলাম, গান্ধীজী তবে এতদিনে স্বাধীনতা সত্যই চাহিলেন !

গান্ধীজী মুক্ত হইয়াছেন এবং অহিংসার আসনে আবার তপস্যায় বসিয়াছেন। ভারতবর্ষের রংগমঞ্চে মুকুট-হীন রাজার মতই তিনি আসিয়াছিলেন। তখন চার পাঁচবছরের বালক ছিলাম, শুনিয়াছি পঁচিশ বছর আগে সেদিন তিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে নাকি ঝড়ের সাগরের মত আন্দোলিত করিয়া-ছিলেন। ইহাও শুনিয়াছি, স্বাধীনতার তোরণদ্বার হইতেই জাতিকে তিনি ফিরাইয়া আনিয়াছেন, প্রবেশ করিতে দেন নাই। প্রেমের পূর্ণকুম্ভে একফোঁটা চোনা নাকি নিক্ষিপ্ত হইয়া-ছিল। স্বাধীনতার বদলে জাতির হাতে অহিংসার উত্তরীয় তুলিয়া দিলেন। নাকের বদলে নরুন পাওয়া গেল, ইহাই সান্ত্বনা এ-জাতির।

অভিশপ্ত জাতি ! বিশ্ববিধানকে পাশ কাটাইয়া ফাঁকি দিয়া আগাইয়া যাইবে—তাই লুব্ধের মত ছুটিয়াছ প্রেমের মরীচিকার পিছনে ! ভাবিয়াছ, অহিংসার আতুর অঞ্জলি দেখিয়া বিশ্ব-বিধান বিগলিত হইবে, মরীচিকায় মরুভূমি ভিজিয়া সিক্ত হইবে ? তা হয় না, হয় নাই কোন দিন। তাই তোমার সেনাপতি শক্তিমান মহাপুরুষ হইয়াও শতাব্দীর একটা প্রহর পার করিয়া দিলেন 'কুইট-ইণ্ডিয়া' বলিতে, 'ডু অর্ ডাই' মন্ত্র দিতে। একদিকে শাসকের মার, অন্যদিকে অহিংসার মার—

এত বড় দুর্ভাগ্য কোন জাতির হইয়াছে বলিতে পার? বল তোমার মহাত্মাকে, জানি কীর্ত্তি তাঁর ইতিহাসে চিরস্মরণীয়, নাম তাঁর মানব সমাজে চিরবরণীয়—তবু তাঁকে বল, যে সাধনায় ঈশ্বর ধরা দেয়, সে সাধনায় স্বাধীনতা আসে না। বল তাঁকে—কুরুক্ষেত্রকে পাশ কাটাইয়া গীতার কৃষ্ণকে প্রেমের তপোবনে পাওয়া যায় না। বল তাঁকে—সত্যের পরীক্ষা হয় না, হউক না হাতে অহিংসার কষ্টিপাথর। বল তাঁকে—গীতা বৈশ্য বিদুর আনেন নাই, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও না; গীতা আনিয়াছেন মহাক্ষত্রিয় কৃষ্ণসখা গাণ্ডীবী অর্জ্জুন। বল তাঁকে—বীর্য্যবান বীরের দৃষ্টিতেই সত্যের বিশ্বরূপ প্রকাশ পায়, প্রকাশ পায় লোকক্ষয়কারী মহাকাল মূর্ত্তি—অহিংসার অন্ধ দৃষ্টিতে সত্যের কল্যাণতম রূপ ধরা দেয় নাই।

সহজ চোখে সৃষ্টিকে দেখিয়া লও। দেখিতে পাইবে,—কোন্ নিষ্ঠুর ফুলের কোমল পর্দা ঠেলিয়া ফলকে বাহিরে আনিতেছে, ফলকে বোঁটা হইতে খসাইয়া ধূলায় ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে, আবার তারই বুক নখরে বিদীর্ণ করিয়া বীজকে বাহির হইবার পথ দিতেছে। কোন্ নির্দয় ব্যাধ নিশীথ রাত্রে শিস্ দিয়া গহ্বরের ঘুমন্ত ভুজঙ্গীকে জাগাইয়া তোলে, বিহগীমাতার পক্ষপুটছায়ায় নিদ্রিত শাবকগুলিকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া লেলাইয়া দিয়া যায়। ভীরু হরিণী ঝরণার জলে তৃষ্ণা মিটায়, কোন গুপ্তচর ক্ষুধার্ত সিংহকে গভীর অরণ্য হইতে ডাকিয়া আনে অতর্কিতে তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে।—এরই নাম বিশ্ব-

বিধান, ইনিই লোকক্ষয়কারী মহাকাল, ইনিই মহাব্যাধ— বিশ্ববিধানের অদৃশ্য পাশ তাঁর হাতে। এঁকে প্রণাম কর,— এঁর কাছে অস্ত্রে দীক্ষা লও,—এঁরই কাছে গ্রহণ কর বীর্যবান পরম শান্তিমন্ত্র।

অহিংসায় উপবাসে শুষ্ক সত্যের পরীক্ষক সন্ন্যাসীর কাছে নয়,— আনন্দের উপাসক মনীষি ঋষি কবির কাছে তোমাদের সত্য পরিচয় জানিয়া লও। তিনি জানাইয়াছেন—"আকাশে ঐ দেব সেনাপতির আহ্বান শোনা যায়, এস মৃত্যু-বিজয়ী।" তাঁরই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রাখ তোমাদের 'নতমস্তকের প্রণাম মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশ্যে।'

ঋষি-কবি তাঁর বিদায়ের দিনে ইংরেজ-সভ্যতাকে অভিশাপ দিয়া বলিয়া দিয়াছেন—'পরিত্রাণ কর্ত্তার জন্মদিন 'আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে।' আমি বলি—শুধু দৈববাণী নয়, কটিবন্ধে তার অমর অস্ত্রও রহিয়াছে, মানুষের অপহৃত মর্য্যাদা ফিরাইয়া আনিবার জন্য। ঋষি-কবি তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে দেখিয়া গিয়াছেন— 'এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে' ইতিহাসের সে নির্মল আত্মপ্রকাশ আরম্ভ হবে মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘ-মুক্ত আকাশে। আমি দেখিয়াছি—সেই সূর্যোদয়ের দেশ আমার এই বাংলা। ঋষি-কবি বলিয়াছেন,—"এল মহাজন্মের লগ্ন।' আমি জানি—ঋষির প্রত্যাশা পূর্ণ হইয়াছে, এই নগরীর রাজ-পথেই ক্ষুধাতুর ভিখারিনী উমা মহাসন্তানকে জন্ম দিয়া গিয়াছে।

দুর্ভিক্ষে নরনারীর মৃত্যুচীৎকারে বাংলার আকাশ আচ্ছন্ন ছিল বলিয়াই তোমরা শিবসীমন্তিনী সতীর প্রসব-ক্রন্দন শুনিতে পাও নাই। নবজাতককে চিনিতে তোমরা পার নাই, রাজপথ হইতে শবস্তূপের সঙ্গে তুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছ গলিত আবর্জনার মত। কিন্তু আমি জানি—শংকরের শিশু-সন্তান, অমরবীর্যে জাত, দেবধাত্রীর স্তন্যে গোপনে পালিত হইতেছে। মহাশূন্যে জ্যোতিষ্ক সমাজ আহ্নিক-আবর্ত্তনের অক্ষমালায় জপ করিয়া চলিয়াছে মহাকুমারের আসন্ন আত্ম-প্রকাশের পরম মন্ত্র—'এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারই হউক জয়।'

মহাবীরের পায়ের তলায় মনে মনে প্রণাম রাখিতে পারিয়াছি, আমার তো কোন রকম অধীরতাই আর নাই।

সময় যে যায়—একথা তবে মনে আসিল কেন? এ-কথা বলিতে পারে, এত খুঁজিয়া তো তেমন আমিটার সাক্ষাৎ কোথাও মিলিল না। সুষুপ্তি হইতে প্রাণীমাত্রেই জাগে প্রাণের ক্ষয়পূরণ করিয়া, উৎসাহ ও শক্তি লইয়া। আমার অদৃষ্টে কেন এমন হইল? সুষুপ্তি হইতে একী সর্বনাশের বিষ লইয়া মন আমার আজ জাগরণে ভাসিয়া উঠিল! সময় যে যায়,—বেশ, যদি তাই হয়, তবে মন লোলুপ আগ্রহে সমস্ত কিছুকে গ্রহণ করিতে আগাইয়া যাইতেছেনা কেন? কেন জড়ের মত স্তব্ধ হইয়া আছে? পৃথিবীর বুক নির্দয় পীড়নে-পেষণে নিংড়াইয়া মধুরস লুণ্ঠনের দস্যুতায় কেন তবে রক্ত আমার উন্মত্ত হইয়া উঠেনা? সময় যায়, যদি তা জানিই, তবে মন কেন

গান গাহিয়া উঠেনা—আয়ু বিহঙ্গ মেলিয়াছে পাখা, হে সাকী অধরে পিয়ালা ধর।

নীচে পাগলাদের মধ্যে একটা হৈ-হৈ উঠিল। উঠানের বেল গাছটাই এই গণ্ডগোল বাধাইয়া বসিয়াছে। জেলের অন্যান্য উঠানে আম বেল নিম কাঁঠাল ইত্যাদি গাছ আছে, এখানে একক বেল গাছটি একপায়ে ত্রিভঙ্গ প্যাটার্ণে খাড়া হইয়া আছে। বেল প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। বলাই বাহুল্য, অধিকাংশই গিয়াছে সিপাহীদের উদরে। কয়েকটা বেল এখনও গাছে ঝুলিয়া আছে, ঘাড় তুলিলেই চোখে পড়ে। নদী কভু নিজ জল পান করে না, বৃক্ষও নিজ ফল ভক্ষণ করেনা—উদারচরিতেরা বরাবরই পরার্থপর হইয়া থাকে। গাছটির কি খেয়াল হইল, বোঁটা হইতে একটি বেল নীচে ছাড়িয়া দিল।

প্রকাণ্ড বেল, তদুপরি পক্ক, তস্যোপরি শান বাঁধানো উঠান, সুতরাং পড়িয়াই ফাটিয়া চৌচির! হরিলুটের বাতাসা ছিটাইয়া দিলে ছেলেবুড়ো সকলেই যেমন হুড়মুড় করিয়া পড়ে, ঠিক তেমনি দৃশ্য, শব্দ-সম্বলিত অবশ্য। পিছনে পড়িয়া গেছে, জানে পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তবু এক উলঙ্গ মহাপুরুষ সেই ভীড়ের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং ঘটোৎকচের মত কয়েকটাকে চাপা দিয়া ফেলিল। বেশ জমিয়া উঠিয়াছে দেখা যাইতেছে। দরজায় সিপাহী পাহারায় নিযুক্ত, তিনিও বাদ গেলেন না, মাথার পাগড়ীটা বাঁ হাতে চাপিয়া ডান হাতে বেটন-লাঠি লইয়া লম্বা পায়ে অকুস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বয়ং হুজুর যে ! ইচ্ছা করিলে এবং ন্যায়ত সবটাই তো লইতে পারেন—এক পাগলা দেখিলাম একটি খণ্ড তাঁর শ্রীহস্তে সম্প্রদান করিয়া দিল। লাঠি তবে কেবল মূর্খদেরই নয়, পাগলেরও মহৌষধ ? সব সময়ে প্রয়োগেরও দরকার হয় না, দেখাইলেই কাজ হয়—এমনই অমোঘ। বুড়া পাগলটি দেয়ালে ঠেস্ দিয়া হাঁটুর উপর হাত দুটা লম্বিত করিয়া বসিয়া ছিল, ঘাড় উঁচু করিয়া একদৃষ্টে গাছটার দিকে তাকাইয়া রহিল। ভাবখানা যেন—হারামজাদা গাছটার আক্কেল দেখ ! বুড়া মানুষ, কাড়িয়া খাইতে পারি না, নিজে তো খাইবে না, তবে একটা বেল এই আমার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলে কি ক্ষতি !

এদিকে আর এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। এক পাগলা যথাসাধ্য খাইয়া বেলের খোলাটা ফেলিয়া দিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে অপরকে তাহা ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইতে দেখিয়া নিজের ভুল বুঝিতে পারিল, ছুটিয়া গিয়া এক প্রচণ্ড চপেটাঘাতে নিজ সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া লইল। কিন্তু খোলা কামড়াইয়া বোধ হয় তেমন জুত লাগিল না, তাহা ফেরৎ দিয়া দিল। অপরে কিন্তু হাত পাতিয়াই গ্রহণ করিল, চপেটাঘাতের কথা মনেও পড়িল না। কথাটা তবে মিথ্যা নয়, আপন ভালো পাগলেও বোঝে।

খাবারের ডাক পড়িয়াছে, মাদ্রাজী ফালতুটা ঘর হইতে ঘরে হাঁক দিয়া চলিয়াছে—'বড় কিচিন খেতে যান বাবু-উ-উ।'

নিরামিষ ও রোগীদের আলাদা রান্নার ব্যবস্থা আছে, বাকীটা 'বড় কিচিন,' অন্যান্য সকলের জন্য। মাদ্রাজী কয়েদীটা বহুকাল এদেশে আছে, বাংলা শিখিয়াছে, মেয়েদের মত সরু ও তীক্ষ্ণ অদ্ভুত গলা, বাবুরা প্রায়ই ডাকিয়া ওর পেটেন্ট চীৎকারটি ফরমাশ করিয়া শুনিয়া থাকেন—"বড় কিচিন খেতে যান বাবু, ছিক্ কিচিন খেতে যান বাবু।"
বোধ হয় অদ্ভুত বস্তু মাত্রেরই প্রতি মানুষের তেমনি অদ্ভুত আকর্ষণ থাকে। আর অসাধারণ কিছুর প্রতি, মানুষ হইলে তো কথাই নাই, বিস্ময় ও শ্রদ্ধা থাকিবে, এ আর আশ্চর্য কি। প্রতিভাবান ব্যক্তির বা ব্যক্তিত্বশালী পুরুষের যে এত মর্যাদা তার কারণও এই, উভয়েই অসাধারণ; এদের সংখ্যা সব সময়েই পৃথিবীতে অতি স্বল্প। এই জন্যই এও দেখা যায় যে, প্রতিভাবান বা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ চরিত্রহীন হইলেও শ্রদ্ধা-ভক্তি হইতে বঞ্চিত হয় না। অদ্ভুতের সঙ্গে অসাধারণের কোথায় যেন একটু মিল আছে, যেমন মিল থাকে মহাজ্ঞানীর সঙ্গে শিশুর বা পাগলের। —সেই অদ্ভুত গলা আবার শোনা গেল, শেষ ঘর সারিয়া ফিরতি পথে মাদ্রাজীটা আবার হাঁক দিয়া চলিল—'বড় কিচিন খেতে যান বাবু-উ-উ।' উঠিয়া পড়িলাম।

দুপুরেও এই ঘরটার বিশ্রাম নাই।

দাবা বসিয়াছে লোহার খাটিয়াতে, টেবিল পাতিয়া বসিয়াছে মাজং, আর বসিয়াছে কম্বল বিছাইয়া পাশা। পাশায় চীৎকার আইন বিরুদ্ধ নয়, কিন্তু দাবাতেও যে এত চীৎকার উঠিতে পারে, এ-অভিজ্ঞতা ক'জনের আছে জানি না। মূল খেলোয়াড় অবশ্য তুজন, কিন্তু মোক্তার জুটিয়াছে জন আষ্টেক, চীৎকারে গ্রীষ্মের তুপুরকে আরও দারুণ করিয়া তুলিয়াছে। কয়েদীরা ঘরে ঘরে তালাবন্ধ হইয়া বিশ্রাম করিতেছে, দেড়টায় তিনঘন্টি বাজিলেই পুনরায় কাজে লাগিয়া যাইবে। সিপাহীরা পর্যন্ত ছায়ায় গিয়া বসিয়াছে, পাগড়ী খুলিয়া ঠেস দিয়া তন্দ্রা ভোগ করিতেছে। সমস্ত জেলটা চুপচাপ, নিঝুম। শুধু এই ঘরটার ঘুম নাই।

আর, বিশ্রাম নাই আমার। মাথার মধ্যে কি আছে জানি না, শুধু দেখি যতক্ষণ জাগিয়া থাকি, ততক্ষণ চিন্তাও সমানে চলিতে থাকে। মাঝে মাঝে মনে হয় আমিই চিন্তাকে চালনা করি। আবার এও দেখি যে, চিন্তাই আমাকে চালনা করে, আমি চলি তার পিছনে পিছনে। চিন্তার চাকাটার বিশ্রাম নাই, এর হাত হইতে নিষ্কৃতির পথও নাই—এক সুষুপ্তি ছাড়া। কিন্তু সে দৈনন্দিন প্রলয়ে চিন্তাই শুধু নয়, আমি নিজেও যে সাময়িক ভাবে গিয়া লুপ্ত হই। আমার চিন্তার সঙ্গে আমার যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তা আর কোন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই নাই।

ব্যাপারটা আমিও যথাসাধ্য ভাবিয়া যে না দেখিয়াছি তা নয়। পৃথিবীকে যখনই পাইতে দেখিতে, বা জানিতে চাই,

তখনই টের পাই, আমারই চিন্তার স্বচ্ছ আচ্ছাদনে নিজেকে আবৃত করিয়া তবে সে আসে। আমার মন আমাকে যে-পৃথিবী দেখায়, তাই আমি দেখিতে বাধ্য হই। আমি ও পৃথিবী কিছুতেই মিলিত হইতে পারি না, মাঝখানে মনের এই ব্যবধান-আবরণ। অথচ এমন মজা যে, ব্যবধানটা মন বোধ করিতেও দেয় না।

ভাবিলেই বুঝিতে পারি যে, আমরা সকলে এক পৃথিবীতে থাকিয়াও এক পৃথিবীতে থাকি না, প্রত্যেকেই নিজস্ব ও পৃথক পৃথিবীতে বাস করিতেছি। মনের বা চিন্তার এই রঙ্গীন কুয়াশা না সরিলে আমরা কিছুতেই পৃথিবীর বা একে অপরের মুখোমুখী কখনও দাঁড়াইতে পারি না। আমরা পৃথিবীতে আসিয়াও পৃথিবী হইতে নির্বাসিত, একে অপরের বাহুবন্ধে থাকিয়াও দুস্তর দূরে রহিয়া গিয়াছি। অভিশপ্ত আমরা, মনের কুয়াশায় পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি—নিজের কাছেও ফিরিতে পথ পাইনা, অন্যের ঘরেও গিয়া উঠিবার রাস্তা দেখিনা।

মনের এ জাল ছাড়াইবার কি কোন পথ নাই ? মুক্তি সম্ভব, এ-বিশ্বাস তো এদেশে বদ্ধমূল। যারা মুক্ত হইয়াছেন, তাঁরা বলিয়া গিয়াছেন, আসক্তি ও কামনা ত্যাগ করিতে পারিলেই নাকি মুক্তি আসে। না, তা আসে না। আসক্তি সরিলেও চিন্তা সরে না। তাছাড়া, আসক্তিটা সর্বশরীরে ও মনে ব্যাপ্ত হইয়া আছে, কোন্ জায়গায় দাঁড়াইয়া কে এবং কিসের জোরে তা ত্যাগ করিবে ?

আমার মনে হয়, চিন্তা হইতে সরিবার কৌশলটুকু আয়ত্ত করিলেই মুক্তি সম্ভব হইতে পারে। চিন্তা একটী বিশেষ যন্ত্র এবং তার বিশেষ স্থানও আছে। কাজেই, তাকে আক্রমণ করিয়া কায়দায় আনিয়া ফেলা দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নয়! ধৈর্য্য ধরিয়া সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলে চিন্তার কেন্দ্রটী ক্রমে ক্রমে এক সময়ে নিজের মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িতে পারে। ইচ্ছামাত্র যেমন চোখ বুজিতে পারি, তখন তেমনি ইচ্ছা মাত্রই চিন্তাকেও স্থগিত করিয়া দেওয়া যাইবে। এবং চিন্তা স্তিমিত হইলেই বুদ্ধি নির্ধূম শিখার মত জ্বলিবার অবকাশ পাইবে। সূর্যের আলো যেমন সূর্য ও জীবজগত উভয়কেই প্রকাশ করে, তেমনি এ-বুদ্ধির আলো একই সঙ্গে আমাকে ও আমি বাদে আর যা আছে সমস্ত কিছুকেই প্রকাশিত ও উদ্ঘটিত করিবে। কেবল তখনই আমার ও পৃথিবীর মধ্যে কোন বাধা ব্যবধান থাকিবে না এবং অপরের সঙ্গে মিলিবার সহজ পথটাও তখন খুলিয়া যাইবে।

কিন্তু চিন্তাকে শান্ত করা সহজ ব্যাপার নয়, সমস্ত শরীর ও মন ইহার প্রতিবন্ধক। এই কারণেই আমি তাকেই শক্তিমান পুরুষ মনে করি, যে কখনও চিন্তার প্রবলতম আন্দোলনেও বিক্ষুব্ধ হয় না। আমার কাছে শান্তরূপই মানুষের শ্রেষ্ঠতম ও মহোত্তমরূপ। কিন্তু আর যেই পারুক, আমার সে ক্ষমতা নাই যে, নিশ্চিন্ত হইতে পারি। আমি জাগিয়া থাকিব, অথচ

চিন্তা করিব না, এ অসম্ভব। তাই, এই গ্রীষ্মের দুপুরেও আমার চিন্তা আমাকে জাগাইয়া রাখিয়াছে।

নিজের অবস্থা যে না বুঝি তা নয়। দুঃখও হয়, হাসিও পায় নিজের দিকে তাকাইয়া। আত্মপীড়াদায়ক চিন্তাটাকে পাশ কাটাইতে চাই, পারি না। যতই এদিক ওদিক মনকে ছুটাছুটি করাই না কেন, অবশেষে সেই একটিমাত্র চিন্তার কাছেই ধরা দিতে হয়—সূত্রবদ্ধ পাখী যেমন অনর্থক শূন্যে পাখা ঝাপটাইয়া সেই শেষটায় বদ্ধস্থানেই আসিয়া পাখা গুটাইয়া বসে। দাঁতের ব্যথার মতও বলিতে পারি, সমস্ত শরীরটা সুস্থ থাকিয়াও কোন কাজে আসেনা, মন সেই আটকা পড়িয়া থাকে দাঁতের গোঁড়ায়। যদিবা কখনও অমনস্ক হই, তবে দাঁতটা এমনভাবে কন-কন করিয়া উঠে যে, যেন চুলির মুঠি ধরিয়া হেঁচকাটানে মনের মুখ সেদিকে ঘুরাইয়া লয়। পাশার চীৎকার বা দাবার হুংকার এর কোন ছলেই মন বাহিরে যাইতে পারে না—যেন রুগ্ন শিশুর শিয়রে মায়ের মত বসিয়া আছি, একটু উঠিতে গেলেই আঁচলে টান পড়ে।

জানালার অর্দ্ধেকটা পর্দা টানিয়া দিয়াছি। জাপানী বোমার ভয়ে বছর দুই আগে এ-গুলি খাটানো হইয়াছিল যাতে বাহিরে গিয়া আলো না পড়িতে পারে। খোলা স্থানটুকু দিয়া দক্ষিণের বাতাস নিম ফুল আনিয়া আমার সম্মুখের মেঝেটায় ছড়াইয়া দিতেছে। শাদা শাদা ফুলগুলির দিকে চাহিয়া আছি, কিন্তু এ উপঢৌকনে সাড়া দিবার আনন্দ ভিতরে নাই।

সূর্য্য মধ্য আকাশ পার হইয়া গিয়াছে, গাছের পায়ের কাছে গুটানো ছায়া একটু একটু পূর্বদিকে বিস্তারিত হইতেছে দেখিয়া অনুমান করি। দৃষ্টিটা দূরে বড়লাটের বাড়ীর ময়দান পর্য্যন্ত যায়—কি একটা প্রকাণ্ড গাছ সবুজ পাতায় ঘন ও বোঝাই হইয়া আছে। একদিক প্রচণ্ড রৌদ্রে পাতিয়া দিয়াছে, অন্যদিকটায় স্নিগ্ধ ছায়া জড়াইয়া রাখিয়াছে—যেন সৌভাগ্যবতী রমণী, একাধারে প্রিয়া ও মাতা, বুকের দুই স্বর্গে স্বামী ও শিশুকে একই সময়ে স্থান দিয়াছে।

সমস্তই দেখিতেছি, কিন্তু কিছুই দেখিতেছি না—তবে আয়নাও বুকে প্রতিফলিত ছবি ও প্রতিচ্ছবিগুলিকে দেখিয়া থাকে। মন যার উন্মনা হয়, কোথাও সে স্থির হইয়া বসিতে পারে না, শুধু যে তাকে উন্মনা করে তাতেই সে স্থিতি পায়। আমার মন হইতে আমি পলাইতে চাই,—ওর সঙ্গ ও সান্নিধ্য অসহ্য হইয়াছে আমার কাছে। কিন্তু আগেই বলিয়াছি তা পারি না, সূত্রবদ্ধ পাখীর মত আটকা পড়িয়া গিয়াছি।

কিছুক্ষণ আগে খেলার সেক্রেটারী ও উৎসাহী কয়েকজন আসিয়া জ্বালাইয়া গিয়াছে। এ-বৎসরের প্রথম ফুটবলম্যাচ, আমাকে নামিতে হইবে। আমি রাজী হই নাই, শরীরটা ভালো না বলিয়া এড়াইয়া গিয়াছি, চোখমুখের দিকে তাকাইয়া তাহারাও বিশ্বাস করিয়াছে। ফুটবল নামিয়াছে প্রায় মাসেক হয়, এখন পর্যন্ত এক পশলা বৃষ্টি হয় নাই, মাঠের যে অবস্থা তাতে আমি একদিনও নামি নাই। খেলাটা আমি ভালোই

জানি, আর একটু চাপিয়া ধরিলেই রাজী হইতাম। যুদ্ধের ঘোড়া বুড়া হইলেও ব্যাঙের আওয়াজ শুনিলে কান খাড়া করে, চারটা খুরেই চাঞ্চল্য আসে—খেলোয়াড়দেরও সেই অবস্থা হইয়া বসে খেলার নামে। রাজী না হইয়া ভালোই করিয়াছি, ভালো খেলিতে পারিলে কি হয়, মনের যে-অবস্থা তাতে কাউকে হয়তো জখম এমনকি খুনও করিয়া ফেলিতে পারি। আমাকে আজ বিশ্বাস না করাই ভালো।—

কি চাই আমি যে, সময় যায় বলিয়া ক্ষোভ বাহির হইয়া পড়িল? আমার, এই নিছক সমরগুপ্তের কি নিজস্ব কোন কামনা আছে, একেবারে ব্যক্তিগত লোভ বা তৃষ্ণা? যে আমিটা দশজনের মধ্যে থাকিয়া দশজনের ঘাত-প্রতিঘাতে সামাজিক মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, তার কামনার কথা জানিতে আমি চাহি না—চাহিয়া কি ফল হইয়াছে তাতো দেখা গেল।

এই পাঁচফুট দশইঞ্চি দীর্ঘ দেহের মধ্যে যে-মন আছে, তার কি নিজস্ব একেবারে আপন কিছু কামনা আছে? মানুষের মনের কথা বলিতেছি না, এই বিশেষ দেহটীর মনের কথাই আমি ভাবিতেছি। সমর গুপ্ত নামটা মিথ্যা, চিনাইবার জন্য একটা শাব্দিক চিহ্ন শুধু—সত্য কেবল সেই নামের আশ্রয় এই দেহটী, আর সত্য তার অধিবাসী লোভী-কামী-পিপাসী মন। দেহ ক্ষণভঙ্গুর, তা আমি জানি। কিন্তু যতক্ষণ সে আছে, ততক্ষণ সে পরম সত্য। দেহের দুয়ার খুলিয়া আমি দেহীর কাছে পৌঁছিতে চাই, এবং জানিয়া লইতে চাই

কি কারণে সে আজ এমন কথা বলিয়া বসিল যে—সময় যে যায়।

প্রায় ত্রিশবছর আগে মাতৃগর্ভে সামান্য একটী রক্তকণিকায় প্রথম আমি আশ্রয় পাই। সে-রক্তফোঁটা বাহিরে ফেলিয়া দিলে বাতাসে শুকাইয়া ধূলায় মিশিয়া যাইত। সেই কণামাত্র রক্ত আমাকে আশ্রয় দিয়া আমারই শক্তিতে প্রাণবান হইয়া উঠিল—অগ্নিস্পর্শে কালো অংগারও যেমন ভিতরে বাহিরে অগ্নিময় হইয়া উঠে। সেই রক্তে কোথাও দৃষ্টি ছিল না, শ্রবণ ছিল না, ছিল না মন। সেই রক্তকে ধারণ ও বহন করিয়া আমি তাকে দেহে রূপান্তরিত করিয়াছি। আমার শুধু কামনাই ছিল না, শক্তিও ছিল, তাই দেহে-ইন্দ্রিয়ে-মনে পূর্ণাংগ ও সজ্জিত হইয়া একদিন মাতৃজঠর হইতে মাতৃক্রোড়ে মায়ের খোকা হইয়া নামিলাম। কি যে আমার আদি কামনা, যার জ্বালায় রক্তকণিকায় দৃষ্টিদান করিয়া চোখের বাতায়ন খুলিলাম? এককথায়, কার অসহ পীড়ন ও প্রার্থনায় এমন মায়াবী আমি হইয়া বসিলাম যে, সমান্য ও তুচ্ছ এককণা রক্তে দেহেন্দ্রিয়ের অপূর্ব ইন্দ্রজাল রচনা করিলাম?

তাই আমিও আজ আর্তপ্রশ্ন করিতেছি,—হে মোর কামনা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ কী অমৃত চাহ তুমি করি বারে পান?

অমৃত না হইয়া বিষ হইলেও ক্ষতি নাই। আমি শুধু জানিতে চাই—কি পানীয় সে প্রার্থনা করে।

দেড়টার তিনঘন্টি বাজিয়া গিয়াছে কিছুক্ষণ আগে। কয়েদী-দেরও বিশ্রামপর্ব শেষ হইয়াছে। এ ঘরের দাবা-পাশার আসরটীও আজ অসময়ে ভাঙ্গিয়া গেল। অন্যান্য দিন বেলা তিনঘটিকা পর্য্যন্ত এই ব্যসন সমানভাবে চলে, টিফিনের সময় হইলেই বাবুরা গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন।
দিবানিদ্রাকেও প্রাচীনেরা কামজ ব্যসনের মধ্যে ফেলিয়াছেন, অর্দ্ধেকের বেশী আমরা দুপুরটা ইহারই সেবা করিয়া থাকি। তাহাও অধিকাংশের অবেলায় ভাঙ্গিতে হইল। এই মহাযোগী-দের তপোভংগের জন্য দায়ী ডাঃ গুহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক, সমস্ত ইউরোপটাই জ্ঞান-অর্জনের মানসে ঘুরিয়া আসিয়াছেন, স্বভাবে বিনয়ী ও চরিত্রে অমায়িক— এককথায় ডাঃ গুহ ভদ্রলোক। প্রশ্ন হইতে পারে, ভদ্রলোক জেলে আসেন কেন? অনেকে হয়তো প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করিয়া বসিবেন, এদেশের ভদ্রলোকেরা বাহিরে থাকেন কোন কৌশলে? প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করা আমার রুচিতে বাধে। ডাঃ গুহের জেলে আসার হেতু, দেশের জন্য তাঁর মমতা এবং সে মমতা মনে গোপন না রাখিয়া কিছু প্রচেষ্টায় প্রকাশ করিয়া ফেলা। এ-দেশে নরহত্যা করিয়া ফস্‌কানো চলে, কিন্তু দেশপ্রেম রুইকাতলা চুনিপুঁটি যে-জাতেরই হউক, ফস্‌কাইতে পারে না, আটকা পড়িতে বাধ্য হয়। ডাঃ গুহও বাধ্য হইয়াছেন।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, জেলে আসিয়াও অধ্যাপকের রেহাই নাই। দশজনের তাগাদায় এবং নিজের স্বভাবের তাড়নায় এখানেও অধ্যাপনা মানে ক্লাশ নেওয়া ও বক্তৃতা দেওয়া এই দুই-ই করিয়া থাকেন। আজ তাঁর সাপ্তাহিক লেকচারের দিন। ফাল্‌তু কয়েদী ঘরে ঘরে হাঁক দিয়া গিয়াছে 'মিটিংগে যান বাবু—পনেরো নম্বর।"

'পনর নম্বর' টুকু সভার স্থান, নীচের একটা ঘর,—কমন রুমের জন্য আমরা আদায় করিয়া লইয়াছি। রোজ সন্ধ্যায় এবং বিশেষ অনুষ্ঠান থাকিলে অন্য সময়েও এখানে আমরা রেডিও শ্রবণ করি। স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় সপ্তাহ, নববর্ষ, রবীন্দ্র উৎসব, শোকসভা, নিজেদের সাধারণ সভা, এক কথায় যাবতীয় কিছুই ঐ ঘরে আমরা সমাপন করিয়া থাকি। একধারে প্রকাণ্ড টেবিল, অনেক গুলি দেশী বিদেশী মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা লইয়া মোটা মোটা গোটা আটেক পায়ে খাড়া রহিয়াছে। চারি পাশে চেয়ার, তাহাতে অধিষ্টিত হইয়া আমরা উক্ত পত্রিকাদি অধ্যয়ন করিয়া থাকি। 'পনর নম্বর' বিশেষ কারণেই আমাদের কাছে আদরণীয় এবং আমাদের স্মৃতিতে এ স্থানটী অবিস্মরণীয়। এই ঘরে বসিয়াই ১৯৩৮ সনে মহাত্মা গান্ধী রাজবন্দীদের সঙ্গে তাঁহাদের মুক্তি বিষয়ে আলাপ করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি জেলের ইতিহাসে, কাজেই, এ দিক দিয়াও ঘরটীর নিজস্ব মর্যাদা আছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শুধু ডাঃ গুহ-ই নন, আরও অনেকেই নানা বিষয়ে এখন বক্তৃতা দিয়া থাকেন। একদিক দিয়া জেলটাকে বিশ্ববিদ্যালয়ই বলা চলে এবং জেলে আসিয়া আমরা গুরুকুলে অবস্থান করিতেছি বলিলে বাড়াইয়া বলা হয় না। আমার মত এবং আমার চেয়েও অধিক মূর্খ অনেকেই এখানে সুযোগের ও সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া পণ্ডিত এমন কি জ্ঞানীই হইয়া গিয়াছেন। জেলটাকেও আমরা রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছি, ভরসা হয়—আমরা নরকে গেলেও শুধু গুলজারই নয়, তার আদ্যোপান্ত এমন রূপসংস্কার করিয়া ছাড়িতে পারিব যে, স্বয়ং যমরাজারও নরক বলিয়া চিনিতে কষ্ট হইবে। মানুষের হাতযশের প্রশংসা তো প্রসিদ্ধই আছে যে, শিবকে বানর বানাইয়া ছাড়ে—আর জেলখানাটা বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া বসিবে, ইহাতে বিস্মিত হইলে চলিবে কেন ?

লোমহর্ষণ-মুনি পর্দাটা বুক দিয়া ঠেলিয়া মদমত্ত হস্তীর মত প্রবেশ করিলেন। পিতৃদত্ত নিজস্ব নাম একটা অবশ্য আছে, কিন্তু এনাম এখানে তিনি অর্জন করিয়াছেন। রাত দশটায় রেডিও শুনিয়া যুদ্ধের জবর জবর কয়েকটা খবর উপর্যুপরি ইনিই ঘরে ঘরে বণ্টন করিয়া ছিলেন, তাই এই উপাধি। পরগাছা মূল বৃক্ষকে ঢাকিয়া ফেলে, লোমহর্ষণ নামটাও তেমনি তাঁর নিজস্ব নামটাকে প্রায় লোপ করিতে বসিয়াছে। এনামে সাড়া দিতে ভদ্রলোক কিন্তু মোটেই আপত্তি করেন না,—

পৈত্রিক সম্পত্তির চেয়ে স্বোপার্জিত সম্পত্তিতে বোধ হয় মানুষে বেশী সুখ ও সম্মান বোধ করিয়া থাকে।

ঢুকিয়াই ধমকের সুরে কহিলেন—বাংলার ইতিহাস খানা দিন তো, তাড়াতাড়ি।

—বাংলার ইতিহাস? কই আমার কাছে নাই তো।

—নাই? কেন ডাঃ গুহ যে বল্লেন আপনার কাছে বই খানা রয়েছে।

—আমার কাছে? না, আপনি ভুল করেছেন।

শুনিয়া এমন ভাবে তাকাইলেন, দেখিয়া বোধ হইল যে মনে মনে তিনি মাথা চুলকাইতেছেন—হয়তো ভুলটাকেই খুঁজিতেছেন।

দয়া হইল এবং সাহায্য করিবারও ইচ্ছা হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—ডাঃ গুহ বল্লেন আমার কাছে?

—তাই তো বল্লেন। সমর বাবুর কাছে আছে, নিয়ে আসুন।

আমারও বুদ্ধিতে বিদ্যুৎ চমক দিয়া গেল, কহিলাম—বোধ হয় অমর বাবুর কথা বলেছেন, শুনতে ভুল করেছেন।

—এই নাও! কানের একটু ঢিলেমীতে কানে ধরে ঘোড় দৌড় করিয়ে ছাড়লে দেখছি। ছোট এখন সেই চব্বিশ নম্বর,—বলিয়া যেমন ভাবে আসিয়া ছিলেন, তেমন ভাবেই বাহির হইয়া গেলেন।

এই ভাবে আর বার কয়েক দয়া করিয়া গতায়াত করিলেই হইয়াছে, আমার পর্দাটার দফা রফা করিয়া ছাড়িবেন! মদমত্ত

হস্তীর সঙ্গে তুলনা খামোকা করি নাই। যাতায়াতের পথে কে বা কি পড়িল, অথবা নিজে কোথায় পড়িলেন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না,—যেন মরি-কি-বাঁচি ছন্দ ছাড়া চলার আর কোন রীতিই মনুষ্যপদযোগ্য নয়।

শুধু বলা হইতেই নয়, চলা দেখিয়াও অনুমান করা যায়—কার তার কোন সুরে বাঁধা। চলা দেখিয়াও বেশ বোঝা যায়—মানুষটা আদপে সিংহ অথবা ভেড়া, সাপ অথবা গরু, এক কথায় মানুষ না জন্তু, অথবা দুয়ের সংমিশ্রণ।

লোমহর্ষণ পর্দায় এমনই ঘর্ষণ দিয়া গেলেন যে, মাঝ খান হইতে মাথায় একটা বাজে চিন্তা উদগার দিয়া উঠিল। নতুবা, মানুষ সম্বন্ধে আমার সুস্থ মনের কিন্তু এ ধারণা নয়। আকৃতিতে মানুষ হইলেই হইল, প্রকৃতির আর কে এত খোঁজ রাখে। মুখটা মানুষের হইলেই মুখ দেখানো চলে, এই যা সুবিধা, নতুবা—থাক। লোমহর্ষণ দেখিতেছি আমাকে সত্যই একটু কুপিত করিয়া গিয়াছেন। ক্রোধে কিছু আবাচ্য চিন্তা বাহির হইয়া পড়িল।

স্যাণ্ডালের ও চটির আওয়াজ শুনিয়া বুঝিলাম, সকলে মিটিংগে চলিয়াছেন। কানে প্রশ্ন আসিল, সমর বাবু আছেন?—মন্মথ বাবুর গলা।

উত্তর দিলাম—আছি

আবার প্রশ্ন আসিল,—যাবেন না ?

উত্তর ফেরৎ দিলাম—না।

এবার আসিল অনুরোধ—চলুন না, শুনে আসা যাক্।

অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলামনা। আপনারা যান।

অনুরোধ বটে, কিন্তু কোন পীড়াপীড়ি বা তাগাদা ছিলনা।

—থাকুন তবে, যাই শুনে আসি, বলিয়া মন্মথ বাবু শুনিতে চলিয়া গেলেন।

আচ্ছা, সবাই যায়, আমি এসব স্থানে যাইনা কেন? আমি কি নিজেকে জ্ঞানী মনে করি, অথবা জ্ঞানের প্রয়োজন আমার শেষ হইয়াছে? কথাটা যখন উঠিয়াই পড়িল, তখন জ্ঞান ও আমি, মানে সে সম্বন্ধে আমার মনোভাব কি, এবিষয়ে আমার বক্তব্যটা বলিয়া যাওয়া ভালো! কথাটা হয়তো দীর্ঘ হইয়া পড়িবে।

প্রথম—জ্ঞান সম্বন্ধে আমার এইটুকু জ্ঞান হইয়াছে যে, জ্ঞানও যেমন অনন্ত, তার বিষয়ও তেমনি অনন্ত। আবার, প্রত্যেকটী বিশেষ বিষয়ের জ্ঞানও অনন্ত সেই যাকে বলে 'অনন্তপারং'—কূল কিনারা কিছুই নাই। অতএব, শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ—তিনি বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, অর্থ বা রাজনীতিবিদ যাহাই হউন এবং তাঁর নিজের বিদ্যায় যতবড় পারঙ্গম হউন না কেন, তাঁরও জ্ঞান সীমাবদ্ধ, 'অনন্তপারং'-এর কাছে গোষ্পদ মাত্র। আমাদের মত রামাশ্যামার তুলনায় জ্ঞান তাঁর প্রায় অসীম, কিন্তু অনন্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে তা ছিটে-ফোঁটা বলিলেও অত্যুক্তি হয়। যিনি যতখানি দীর্ঘায়ুই হননা কেন, অসীম কালের মাপ কাঠিতে ক্ষণায়ুই তিনি, সেই রকম আর কি!

এইটুকু শুধু যে বুদ্ধি দিয়া বুঝিয়াছি তাই নয়, আমার স্বভাবে ও ব্যবহারেও স্বীকৃত হইয়াছে। তাই, মনে আমার শিশুর কৌতূহল থাকিলেও, সে জ্ঞানস্পৃহার মুখে বল্‌গা লাগানো রহিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাসও মনে আসিয়া গিয়াছে যে, অনন্ত জ্ঞানকে আয়ত্ত করিবার পন্থা এ নয়। বহুকে জানিয়া, অন্য কথায়—অসংখ্য সসীমকে জানিয়া, এককে মানে অসীমকে জানা যায় না। জ্ঞানের ক্ষুধা যার অসীম, জানার ইচ্ছার যার শেষ নাই, সে হতভাগ্যকে একঘরে হইয়াই থাকিতে হয়। এ তার অহংকার নয়, এ তার অদৃষ্ট বা বিধিলিপি।

কেন মানুষ জানিতে চায় ?

তা আমি জানি না। প্রাণিজগতে অন্যত্র এই জানার প্রবৃত্তিটী আছে বলিয়াও আমার মনে হয় না। প্রাণধারণের প্রবৃত্তিটী ব্যতীত সেখানে আর অন্য যা কিছু আছে, তা এই প্রাণপ্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়াই আছে—বাঁচাই আছে, জানা বলিয়া কোন কিছু সেখানে নাই। শুধু মানুষের স্তরে আসিয়াই বুদ্ধি নামক একটী আলো প্রাণের শীর্ষে জ্বলিতে দেখা যায় এবং জানার ইচ্ছা নামক জ্বালাও টের পাওয়া যায়। ফলে, সমস্ত প্রাণিজগতের বাসিন্দা হইয়াও মানুষ সমস্ত প্রাণী হইতেই একেবারে পৃথক ভিন্ন হইয়া গেল।

কথাটা অন্যভাবে বলি।

অনন্ত কাল আকারহীন রূপহীন জড়কে কোলে লইয়া প্রকৃতি সাধনা করিয়াছে—পক্ষিমাতা যেমন ডিমের উপর বসিয়া

নবজাতকের প্রতীক্ষা করে। বহু অপেক্ষার পরে জড়ে প্রাণ সঞ্চার হইল—সেদিন প্রকৃতির সাধনার প্রথম সিদ্ধি। সেই প্রাণই অণুতম শৈবালকে পাথেয় করিয়া যাত্রা সুরু করিয়াছিল—ক্রমে অরণ্য ও জীবজগতে সে-প্রাণ অসংখ্য দেহে অসংখ্যরূপে ছড়াইয়া পড়িল।

প্রকৃতির প্রতীক্ষা শেষ হয় নাই তখনও। দীর্ঘকাল পরে দেখা দিল মন বা বুদ্ধি, প্রকৃতির শেষ সিদ্ধি। জড়ের আড়ালে যে-প্রাণ গূঢ় গোপন ছিল, প্রকৃতি তাকে মন্থিত করিয়া লইয়াছে পূর্বেই। প্রাণের আড়ালে যে-মন ঘুমন্ত ছিল, তাহাকে প্রকৃতি যখন জাগাইয়া তুলিল, সেদিনই সৃষ্টিতে প্রকৃতি প্রথম আত্ম-ঘোষণা করিল—আমি! এই আমি-তে আসিয়াই প্রকৃতি নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিয়াছে—তার শক্তি ও মুক্তির দুইয়েরই পূর্ণ প্রকাশ ও আস্বাদন লাভ করিয়াছে এই আমি-র স্তরে আসিয়া।

এই আমিই অসংখ্য দিকে অসংখ্যভাবে অসংখ্য প্রাণে ফুটিয়াছে, অসীম আকাশে সংখ্যাহীন তারার মত। কিন্তু সব তারার আলো সমান নয়, সব তারা সমান জ্যোতি দেয় না। অরণ্যজগতে গাছে-গুল্মে এ-আমির প্রকাশ আছে, কিন্তু গতি বা ভাষা নাই। পশু-পক্ষীর প্রদেশে এ-আমি গতিবান কিন্তু ভাবাহীন, বুদ্ধির জ্যোতি সেখানে স্তিমিত অন্ধ।

মানুষের সীমানায় যখন আসি—তখন গতি পাই, জ্যোতিও

পাই। প্রকৃতির পরিচয় এখানে সর্বাঙ্গ। মানুষ দুই পায়ে সোজা দাঁড়াইয়াছে, দৃষ্টির যে আবদ্ধতা ও ত্রুটি ছিল পশুজগতে, তা অপসারিত হইয়াছে,—ললাটের দুই চোখে জ্যোতির শিখা তার। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, জন্ম-মৃত্যু সব কিছুকে দেখিয়া এবং সে দেখাও ছাড়াইয়া সমগ্রকে দেখিবার অধিকার কেবল এইখানেই প্রকৃতির রহিয়াছে। সমস্ত সৃষ্টিতে মানুষই শুধু প্রকৃতির হাতে প্রদীপশিখা, এ আলো নিভিয়া গেলে গাঢ় অন্ধকারে প্রকৃতিকে আবার হারানো-আলো জ্বালিবার জন্য পূর্বের মত কৃচ্ছ্র ও দীর্ঘ সাধনায় বসিতে হইবে।

প্রকৃতির নিজ সাধনায় মানুষ পর্যন্ত আসিয়াছে জড় হইতে যাত্রা সুরু করিয়া। এখানে আসিয়াই কি বিবর্তন-ধারার গতি শেষ হইয়াছে, তেলের ধারা যেমন শিখায় আসিয়া শেষ হয়?

বহির্জগতের দিক দিয়া প্রকৃতির বিবর্তন-পথে যাত্রার সমাপ্তি ও সীমা এইখানেই বটে। কত ভাঙ্গা-গড়া, কত আশা-নিরাশা, কত গভীর কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্য দিয়া প্রকৃতির সে-ইতিহাস রচিত হইয়াছে, তাহা কে জানে! সহায়হীনা সে একাই পথ চলিয়া আসিয়াছে। আমি-কে পাইয়া তবে সৃষ্টিতে সাথী ও দোসর সে পাইয়াছে—এখন আর বিবর্তনের পথে সে একা নয়।

এইখান হইতেই বিবর্তনের পথটা অন্য জগতে প্রবেশ করিয়াছে,—বহির্জগৎ হইতে আড়ালের জগতে তা মোড় ঘুরিয়াছে। জড় হইতে যাত্রা করিয়া প্রকৃতি আমি-তে আসিয়াছে

জড়ের আড়ালে যে-আমি ছিল, তাহাকে বাহিরে আনিবার জন্য। এই আমি-র কেন্দ্র হইতে পুনরায় জড়ের আড়ালের সেই প্রথম ও শেষ সীমায় তাহাকে যাইতে হইবে। পূর্বে সে ছিল সহায়হীনা একক শক্তি। এবার সঙ্গে তার আমি বা আলো।

বিবর্তনের প্রথমার্ধে প্রকৃতির ইতিহাস, দ্বিতীয়ার্ধে সেই ইতিহাসের উল্টোপথে পুনরাবৃত্তি, কিন্তু সে-ইতিহাস আমি-র ইতিহাস। এখন হইতে বিবর্তনের জন্য আমি-র সচেতন প্রচেষ্টার প্রয়োজন, প্রকৃতি শুধু গৃহিণী, কিন্তু কর্ত্রী আর সে নয়। প্রকৃতির ক্ষেত্রেই মানুষের প্রথম জন্ম, এখন অন্তর্জগতে মানুষের দ্বিতীয় জন্মের আবশ্যক। অর্থাৎ তাকে দ্বিজ হইতে হইবে। বিবর্তনের ইহাই নির্দেশ, প্রকৃতির বাকী সাধনা এই পথেই সাধিত হইবে। পশুকে দিয়া বা পোকা-মাকড়কে দিয়া এই দ্বিজত্ব সম্ভব নয়। শুধু মানুষের কাছেই প্রকৃতির প্রার্থনা এবং মানুষই কেবল তা পূর্ণ করিতে পারে।

এই আমি-টী মানুষে যখন আশ্রয় নিল, তখন হাতে তার বুদ্ধি বা মনের মায়া-প্রদীপ। এই বুদ্ধিকে মানুষ প্রয়োগ করিয়াছে প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কারের জন্য, অর্থাৎ প্রকৃতিকে জানিতে। আসলে প্রকৃতিকে জানিতে নয় জয় করিতেই এই বুদ্ধিকে মানুষ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। মানুষের বিজ্ঞানের সাধনা ও সভ্যতা এইখান হইতেই সৃষ্ট হইয়া আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আসিয়াছে।

প্রকৃতি বহুল পরিমাণে বশীভূত হইয়াছে এবং প্রচুর ঐশ্বর্যও তার কাছ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। কিন্তু বিবর্তনের অগ্রগতি এই বিজ্ঞানসাধনায় বা ঐশ্বর্যলাভে ইঞ্চিমাত্রও অগ্রসর হয় নাই। প্রকৃতি তো পূর্বেই ধরা দিয়াছে, আমি-র কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে। নিজেকে সে দিয়াছে, তাইতো মানুষ এত পাইতে পারিয়াছে—বিজ্ঞান শক্তি যে তারই দান। কিন্তু প্রকৃতির দুঃখ তাতে ঘোচে নাই, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত প্রার্থনা ও কামনার দিকে মানুষ তেমন কর্ণপাত করে নাই।

ফলে, বিজ্ঞান মানুষের হাতে দেবতার শক্তি দিয়াছে—কিন্তু দেবত্ব দান করিতে পারে নাই, অর্থাৎ প্রকৃতির মনের মানুষটী করে নাই। প্রকৃতি নিজেকে বুদ্ধিতে পরিণত করিয়া মানুষের হাতে অপরিসীম শক্তি ও সম্ভাবনা তুলিয়া দিয়াছে, মানুষের মধ্যেকার প্রাণ মানে পশুই তা ব্যবহার করিতেছে, পিছনে ফেলিয়া-আসা সেই প্রাণের ও জড়ের দিকেই মানুষ না জানিয়া প্রকৃতিকে ঠেলিয়া দিতেছে। এই কারণেই লোভ, হিংসা, ভয় ইত্যাদি প্রবৃত্তি যা পশুর বা প্রাণের ধর্ম, তাহাই বর্তমান বিজ্ঞানসভ্যতা ও সমাজের ধারক ও বাহক রহিয়া গিয়াছে। প্রাণ ও জড়ের আকর্ষণ হইতে আমি-কে মুক্ত করিতে বুদ্ধি প্রযুক্ত হয় নাই, মানুষের ত্রুটিতে আমি-টী তাই বিবর্তনের গতিপথ হইতে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইখানেই প্রকৃতির সমস্যা এবং মানুষের ইতিহাসও ভয়াবহ সমস্যা ও প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছে। উত্তর একক ও সমাজ-

গত দুইভাবেই মানুষকে দিতে হইবে। নতুবা মানুষের ইতিহাস মানুষের রক্তে নিত্য সিক্ত ও দুঃখে অহরহঃ তিক্ত থাকিবে। প্রকৃতি রেহাই দিবে না, ব্যর্থতা সে গ্রহণ করিবে না। সমস্ত শক্তি তারই, প্রয়োজন হইলে নিযুত কোটি বৎসর মানুষকে এই জাতীয় ক্ষতি ও ক্ষয়ের আঘাত দিয়া সচেতন সে করিয়া তুলিবেই। তার আসল আমি-কে পাওয়ার জন্যই শুধু এই অসমাপ্ত ও অসম্পূর্ণ মানুষের দ্বারস্থ সে হইয়াছে। কারণ, এই মানুষের মধ্যেই তার মনের মানুষটী নবজন্মের প্রতীক্ষা করিতেছে। বিবর্তনের পথে মানুষকে সে আকর্ষণ করিয়া লইবেই, নতুবা প্রকৃতির মুক্তি সম্ভব হয় না।

বুদ্ধির সম্মুখে প্রকৃতির যে-দিকটা তা আমাদের জানা আছে। এই জানাটাকে তথ্যে ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ করিতেই আমার জেল-বন্ধুরা ও বাহিরের শিক্ষায়নের ছাত্র ও পণ্ডিতেরা ব্যস্ত। আমার মন সেই-জানার জন্য লোভী হয় না। যাহা জানা হইয়াছে, তাহা জানিতে আমার তেমন আগ্রহ নাই। বুদ্ধিকে তো সম্পত্তি হিসাবে জন্মের সঙ্গেই পাইয়াছি। অর্থাৎ, জড় হইতে বুদ্ধি পর্যন্ত পথটা সমস্তই বুদ্ধির অন্তর্ভুক্তই রহিয়াছে। জড় হইতে সাঁতার দিয়া বুদ্ধি আজ আমির তট-স্পর্শ করিয়াছে। আমির এই তটে উত্তীর্ণ হইতে হইবে এবং সেখানেই বুদ্ধির নূতন জানা অপেক্ষা করিতেছে। প্রকৃতি বুদ্ধিকে আমির কেন্দ্রে বহির্মুখ করিয়া দাঁড় করাইয়াছে, সেই আমিটিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই আমার মধ্যে প্রকৃতির অভীপ্সা সিদ্ধ

হয়। —এইভাবেই জানার ইচ্ছাটা আমার মধ্যে কাজ করে দেখিতে পাই।

জড়ের আড়াল হইতে যে-বেদনা ও কামনা লইয়া প্রকৃতি আমির সন্ধানে কোটি কোটি আলোকবৎসর পথ চলিয়াছে, সেই পূর্ণ আমিটিকে যদি আমার মধ্যে আমি তাকে জানিতে দেই, আবিষ্কার করিতে দেই, পাইতে দেই,—তবেই এই অভিসারিকা পূর্ণপ্রেমে ও প্রাপ্তিতে তৃপ্ত ও সার্থক হইতে পারে। তখনই প্রকৃতি আপনার সত্য রহস্য আপনি জানিতে পারিবে। জানিতে পারিবে যে, না জানিয়া যে-আমির আকর্ষণে সে উন্মাদিনীর মত বিবর্তনের বন্ধুর পথে বাহির হইয়াছিল, আদিতেও সেই আমি-ই আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাকে চঞ্চল করিয়াছে। জানিতে পারিবে যে, সর্বস্তরে সর্ব অবস্থায় এই আমিটি নিত্য তার অভ্যন্তরে থাকিয়া তাকে চালনা করিয়াছে অন্তর্যামী রূপে। আর নিজের পরিপূর্ণ আমিত্বে থাকিয়া এই আমি-ই তাকে নিরন্তর সম্মুখের দিকে আকর্ষণ করিয়াছে পূর্ণ-প্রেমের মিলন-মোহানায়। শক্তি ও শক্তির লীলার ইহাই অন্তহীন রহস্য ও উদ্দেশ্য একাধারে।

মানব সমাজে যাঁরা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, বর্তমান সভ্যতাকে যাঁরা গঠন করিয়াছেন, তাঁদের জ্ঞান ও জ্ঞানের ক্ষেত্রকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁরা বুদ্ধির সীমা জানেন নাই, ক্ষুরধার বা বলিষ্ঠ বুদ্ধি পাইয়া তাহা ব্যবহারই করিয়া

গিয়াছেন কেবল। বুদ্ধির সীমা যিনি জানেন নাই, তাঁর শিষ্যত্ব নিতে আমি পারি না।

বিজ্ঞান ও তার দানকে তুচ্ছ বলিব, কে আমি! প্রকৃতির অন্তহীন সাধনায় লব্ধ সিদ্ধিকে তুচ্ছ বলিবার স্পর্ধা যারই থাক আমার নাই। আমি শুধু নিজেকে বলি, আরও আছে, এই শেষ নয়। বুদ্ধির সীমাও উত্তীর্ণ হইবে, তবেই বিবর্তনের অন্য-স্তরে প্রকৃতির ধারাটি মুক্তি পায়। নজেকে আমি নিত্য স্মরণ করাই—'যাহা জানিবার কোনকালে তার জেনেছি যে কোন কিছু, কে তাহা বলিতে পারে।' না জানিয়াও যেন আমি জানিয়াছি যে, দিয়া প্রকৃতির সামান্য-তম অংশ ও ঐশ্বর্য জয় হইয়াছে। কেন জানি না আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, প্রকৃতির আমিটিকে জানিলে অর্থাৎ মানুষ যদি নিজেকে নিজে জানিতে পারে, তবে সে-জানায় সমগ্র প্রকৃতিই পুরুষের বাহুবন্দী হইবে জয়লব্ধা লক্ষ্মীর মত। এই রকম মনের জন্যই তাই সকলের মধ্যে থাকিয়াও আমি একা। আমার প্রকৃতির কাছে বিশ্বাসঘাতক হইতে পারি এমন শক্তি আমার নাই।

—"বাবু"—

ডাক শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলাম, ঘুমন্ত মানুষকে হঠাৎ জাগাইলে যেমন ধাক্কা লাগে, তেমনি বোধ করিলাম। নিজের চিন্তায় এত নিমগ্ন ছিলাম যে, টেরও পাই নাই কখন একটা লোক শিয়রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কহিলাম—"কে ?"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখি সূর্য কয়েদী। অল্প বয়সের হিন্দুস্থানী, শরীরটা রক্ত মাংসের নয় যেন কালো পাথর কুঁদিয়া গড়া। আগে এই ঘরেই কাজ করিত, কি এক অপরাধ করায় মাস খানেক ঘানি টানিয়া আসিয়াছে, এখন অন্য ঘরে কাজ করে। ওকে আমি বিশেষ একটু স্নেহ করি এবং সূর্য না বলিয়া সরযূ বলিয়া ডাকিয়া থাকি। নামটার পরিবর্তনে শ্রীমান প্রথম খুব হাস্য করিত, পরে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। মাঝে মাঝে এখনও আমার খোঁজ লইয়া যায়। অসময়ে চা-পানীয়ও সংগ্রহ করিয়া আমাকে পান করাইয়া থাকে।

—কিরে, খবর কি ?

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে অস্পষ্টভাবে কহিল, শলাই।
—শলাই কি ? ভালো করে বল না। উৎসাহ পাইয়াও ষ্টাইল বদল করিল না, পূর্বের গলায়ই কহিল, একটা কাঠি—
—কি, দেশলাইয়ের একটা কাঠি চাই ?

চোখের এবং বদনের ঈষৎ বিস্ফারণে জানাইয়া দিল যে, আমি ঠিকই অনুমান করিয়াছি, তাই মুখে একটা হুঁ পর্যন্ত দিল না। বালিশের তলাতেই ছিল, দেশলাই হইতে গোটা কয়েক কাঠি খুলিয়া দিলাম,—নে ভাগ এখন। কিন্তু ভাগিবার কোন ইচ্ছাই তার দেখিলাম না। আমারও মনের অবস্থা এমন নয় যে, এর সঙ্গে এখন কথা বলি।

কহিলাম, দাঁড়িয়ে আছিস যে ? অর্থাৎ, আর কিছু দরকার না থাকলে সরিয়া পড়িতে পারে, ওদেরই ভাষায়, কেটে পড় বাবা। উত্তর আসিল,—ধরাবো কি ?

আমারও বদন প্রায় বিস্ফারিত হইবার উপক্রম হইল। কি ধরাইবে শ্রীমান নিজে জানে না, আমাকে বলিয়া দিতে হইবে! অথচ, এদিকে দেশলাইয়ের কাঠি হস্তজাত করিয়া লইয়াছে। ও কি মনে করে জেলের কোথাও আগুন ধরানো বিষয়ে আমার বিশেষ একটা ইচ্ছা আছে! বলিতে যাইতেছিলাম, নিজের মুখেই আগুন ধরাইতে পারে হনুমানের গরজটা যদি এতই হইয়া থাকে।

কিন্তু শ্রীমান পরিষ্কার গলায় জানাইল,—বিড়ি নাই, ধরাবো কি ?

বিস্ময় আমার ডিগবাজী খাইয়া একপলকে কৌতুকে ও হাস্যে ভিতরটায় গড়াগড়ি দিয়া উঠিল।

কহিলাম,—হারামজাদা, ধরাবো কি! তবে কাঠি নিলি কেন, বিড়ি চাইতে পারলি নে ? যা, এ কাগজের বাক্সে আছে, নিয়ে ভাগ্।

উঃ, কী ভয়ংকর বদমাস! কান টানিলে মাথা পাওয়া যায় প্যাঁচ কষিয়া বসিয়াছে দেখিতেছি। হাতে বিড়ি এবং চোখে-মুখে চাপা হাসি লইয়া শ্রীমানতো বাহির হইয়া গেল, কিন্তু আমি একা একা এখন হাসি কি করিয়া। ধারে কাছেও কাহাকে

দেখিতেছি না যে বলিয়া দমমুক্ত করিব। মনের রংই বদলাইয়া দিয়াছে। চিন্তার জটিল পথে সরীসৃপের মত বুকে হাঁটিতেছিলাম, মানুষের রসভোগের জীবনক্ষেত্রেই সরযূ আমাকে এক হেঁচকা-টানে দুই পায়ের উপর দাঁড় করাইয়া দিল। চিন্তার হাত হইতে সাময়িক মুক্তিতে বুকে যেন খানিকটা তাজা বাতাস ঢুকিয়া পড়িল।

সরযূই একদিন আমাকে একা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, —এত শোচতা হ্যায় কাঁহে।

—শোচতা হ্যায় কিরে বেটা। সভ্য ভাষায় বল। সভ্য ভাষায় মানে বাংলাতে বলিয়াছিল,—এত ভাবেন কেন ?

ভাবখানা এই যে, ভাবিয়া কোন কূল কিনারা হয় না, মাঝখান হইতে মনের বাজে খরচ ও শক্তি ক্ষয় হয়, দুঃখটাই ফাউ হিসাবে খামোকা পাওনা হয়। অথবা, কি আমার এত ভাবনা তা সে জানিতে চায়, মন দিয়া যথাসাধ্য তা ভাগ করিয়া লইতে চায়—এও হইতে পারে।

মুখে উত্তর দিয়াছিলাম,—ভাগ লক্ষ্মীছাড়া, এত ভাবি কেন ওকে বলতে হবে। আমার গুরুমশায় এয়েছেন।

সেদিন যাইবার আগে আমার নিন্দা মুখের উপরই করিয়া গেল যে, আমিই নাকি এই জেলে একমাত্র লোক যে সব সময় ওর ভাষাতে শোচতা হ্যায়। ওর মুখে বুদ্ধিমানের মত কথা শুনিয়া সত্যই বিস্মিত হইয়াছিলাম।

ওর বিড়ি আদায়ের ফন্দিটুকু উপভোগ ও তারিফ করিলাম। মনে মনে বলিলাম, জিতা রহ বেটা। রসবোধ যে ভাগ্যের কত বড় দান, ও হয়তো তা জানে না, তবু ও ভাগ্যবান। কিন্তু বহু শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই দেখা যায় এদিক দিয়া তাঁরা রীতিমত ভাগ্যহীন। তাঁদের সংস্পর্শে আসিয়া অহরহঃ মনে পড়ে যে, অরসিকের কাছে রস-নিবেদন কত কঠিন শাস্তি এবং অরসিকের রস-নিবেদন যে তার চেয়েও কত কঠিনতর ও অসহ্য শাস্তি তখনই টের পাই যখন তাঁহারা মুখ খোলেন। পৃথিবীতে জ্ঞানী কর্মী ইত্যাদির সংখ্যাটা একটু কমিয়া যদি রসিকের সংখ্যাটা বৃদ্ধি পাইত, তবে পৃথিবীটা আরও সুন্দর, লোভনীয় ও বাসোপযোগী হইত, এ আমি তাম্রপত্রে লিখিয়া প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

যা বলিতেছিলাম—বুদ্ধি দিয়া জানা ছাড়া আর একরকম জানা আছে, প্রচলিত ভাষায়,—হৃদয় দিয়া জানা। জ্ঞানের পরিভাষায় উপলব্ধি। উপলব্ধি বা হৃদয় দিয়া জানায় বিষয়-বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগ স্থাপিত হয় এবং এই জানাতেই কেবল মানসিক গঠনে স্বাস্থ্য ও পরিবর্তন আসে। খাদ্যকে শরীর যে আশ্চর্য উপায়ে রক্ত মাংস স্নায়ুমজ্জা ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করিয়া লয়, এই জাতীয় জানাও তেমনি ভাবে তুষ্টি তেজ শক্তি ইত্যাদি রূপে মনের অঙ্গীভূত হইয়া থাকে। গাছের পাতা আলো-বাতাস হইতে রৌদ্ররস ও প্রাণরস দুই-ই আকর্ষণ

করে, ঠিক তেমনি উপায়ে হৃদয় এই জানার পথে বস্তুজগৎ হইতে প্রাণরস ও আনন্দরস দুইই আহরণ করে।

ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর এই উপলব্ধির তারতম্য নির্ভর করে। গাছের শিকড় যত গভীরে প্রবেশ করে মৃত্তিকার রস ততই প্রচুর পরিমাণে পান করিতে পায়, উপলব্ধির গভীরতায় প্রাপ্তিও তেমনি জমাট ও প্রচুর হইয়া থাকে। হৃদয়ে যারা দরিদ্র, জীবন ও পৃথিবী দুইই তাদের কাছে কঠিন ও অনুর্বর। হৃদয় যাদের যত সংবেদনশীল, পৃথিবী ও জীবন ততই তাদের কাছে রসময় ও ঐশ্বর্যবহুল। কে কোন্ জগতে বাস করে, হৃদয়েই তার পরিচয়, উপলব্ধিতেই তার মাপকাঠি। উপ-লব্ধিতেই জীবনের উপর অধিকার অর্জিত হয়। জীবন ও পৃথিবী আত্মসম্পত্তিতে পরিণত হয়। একমাত্র হৃদয়ের গ্রন্থিতেই পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের নাড়ীর যোগ রহিয়াছে, —এ-গ্রন্থি যাদের যত দুর্বল, শ্লথ কিংবা ছিন্ন, সেই অনুপাতে জীবনক্ষেত্রে তারা কমবেশী বঞ্চিত, শুষ্ক ও ব্যর্থ।

বুদ্ধির গভীরতায় সত্য সম্বন্ধে দৃষ্টি উত্তরোত্তর মুক্ত হয়, কিন্তু উপলব্ধির গভীরতায় সত্য, যাকে 'রিয়ালিটী' বলা হয়, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগসম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বুদ্ধির চরমপ্রকাশ সত্যদ্রষ্টার মধ্যে, উপলব্ধির পরম প্রকাশ রসস্রষ্টা ও ভোক্তার মধ্যে। সূক্ষ্ম বিচারে হয়তো নিছক দৃষ্টি বা কেবল উপলব্ধি বলিয়া কিছু নাই, একের মধ্যে অপরটিও অল্পবিস্তর জড়িত থাকে। উভয়ের মধ্যেই জানা বলিয়া ব্যাপারটা সাধারণ।

কিন্তু পার্থক্য উভয়ের মধ্যে বড় রকমেরই রহিয়াছে। বুদ্ধিতে আমরা সত্যকে জানি, কিন্তু উপলব্ধিতে সত্যকে শুধু জানি তাই নয়, সত্যকে আমরা পাই-ও এবং সত্যকে বা 'রিয়ালিটীকে' যতটা পাই, ততটা আমরা হইয়া-ও উঠি। বুদ্ধির জানায় প্রতিভা ও মনীষা পাই, উপলব্ধির জানায় ব্যক্তিত্ব ও স্রষ্টাকে পাই। ইংরেজীতে যাকে বলে 'জীনয়স', তা পাই বুদ্ধির পথে, আর যাকে বলে 'পার্স্যালিটী' তা পাই হৃদয়ের বা উপলব্ধির পথে। ধর্ম, রাষ্ট্র ও সমাজের বৃহত্তম বিপ্লব ও পরিবর্তনের মূলে এই ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্বের মূলে ব্যক্তিগত উপলব্ধির গভীরতা। সত্য জানা হইতে পাওয়ায়, পাওয়া হইতে হওয়ায়—এই গোপন পথেই সমস্ত মহাপুরুষ, মহাবীর ও মহাকর্মীকে প্রকৃতি ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আনিয়াছে। বুদ্ধির মধ্য দিয়া প্রকৃতির একটি রাস্তা আছে সত্যকে জানার, কিন্তু সে-পথ শুধু দুর্গমই নয়, ক্ষুরধারার মত শাণিত ও বিপজ্জনক, কম পথিকই সে-পথের অধিকারী। হৃদয়ের মধ্য দিয়াই প্রকৃতির রাজপথ সত্যকে জানার, সে সহজপথে আমরা সকলেই জন্মপথিক।

বুদ্ধি ও হৃদয়ের পথে মায়াবিনী প্রকৃতি যাদুখেলা খেলিয়া চলিয়াছে। হৃদয়ের পথেই এই যাদুর ভেল্‌কী অধিক দৃষ্ট হয়। অসংখ্যবার দেখা গিয়াছে যে, তুচ্ছকে প্রকৃতি অসাধারণ করিয়াছে, ক্ষুদ্রকে করিয়াছে বিরাট এবং নীচকে করিয়াছে মহৎ—ইতিহাসে এ-দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রাচীনেরা ইহাকেই

অন্যভাবে বুঝাইয়াছেন—পঙ্গুকে দিয়া পর্বত লঙ্ঘন করানো, বোবাকে মুখর করিয়া তোলা এবং জোনাকীর জ্যোতিতে সূর্যকে নিষ্প্রভ করা। এমনই প্রকৃতির অঘটনঘটনপটিয়সী যাদুশক্তি, মানুষের এই ছোট্ট হৃদয়টিই প্রকৃতির সে অপূর্ব শক্তির খেলাঘর।

মনীষা ও ব্যক্তিত্ব স্বল্পসংখ্যক চিরকালই। বাদবাকী অগণিত সাধারণের দল, তারাও প্রকৃতির এই মায়াকাঠির ছোঁয়া হইতে বঞ্চিত হয় নাই। প্রকাণ্ড পদ্ম ফুলের পিছনে প্রকৃতির যে অধ্যবসায়, ছোট্ট যুঁই ফুলটীর জন্যও ততখানি প্রচেষ্টাই প্রকৃতির সর্বদা ন্যস্ত। হৃদয়ের ঐ একই পথে সাধারণেরাও নিজ নিজ সংসারে ও জীবনে সার্থক ও ফলবান হইয়া উঠে। স্নেহ-প্রেম-শ্রদ্ধা ইহারাই প্রকৃতির সেই মায়া-রসায়ন, অমোঘ যার প্রক্রিয়া। যে রহস্যময় পথে খাদ্য হইয়া উঠে দেহেন্দ্রিয়ের সম্পত্তি, সেই মায়াপথেই মানুষ হইয়া উঠে মানুষের আপন ও আত্মীয়। যারা ভালোবাসিয়াছে, স্নেহ করিয়াছে, শ্রদ্ধা দিয়াছে, সংসারে সুখ ও শান্তি তারাই আনিয়াছে ও পাইয়াছে। মানসলোকের এ রসসম্পদ আকর্ষণ করিবার অন্য কোন কৌশল নাই। শ্রদ্ধা-প্রেম-স্নেহহীন মানুষ হৃদয়শূন্য সৃষ্টি প্রকৃতির, সৃষ্টিতে তারাই অনাসৃষ্টি। নিজের জীবনও তাদের শূন্য, অপরের জীবনেও তারা ব্যর্থ।

যে-আনন্দে প্রকৃতির বিরাট সৃষ্টিলীলা, তাহাই মানুষের হৃদয়-বৃন্তে স্নেহ-প্রেম-শ্রদ্ধা হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মৃত্তিকার

প্রাণরস যেমন ফুলের পেয়ালায় ঘনীভূত রূপ ও আকার গ্রহণ করে, প্রকৃতির জমাটবাঁধা আনন্দরসও তেমনি হৃদয়ের সহস্র-দল পদ্মে সহস্ররূপে ও আকারে আত্মপ্রকাশ করে। সুখের তৃষ্ণা মানুষের আনন্দের পিপাসা তার, অথচ হৃদয়ের মধু-কোষের এত সঞ্চয় জানিয়াও সে জানিতে চায় না। কস্তূরী মৃগের মত, চতুর্দিকে পাগল হইয়া খুঁজিয়া বেড়ায় গন্ধের উৎস কোথায়,—এমনই মানুষের অদৃষ্ট। হৃদয়ের সমস্ত মধু-সঞ্চয় ব্যর্থ হইয়া যায়, বাহিরে মরীচিকার কাছে মানুষ পানীয় প্রার্থনা করিয়া মরে। জানি নিজের সে অধিকার অর্জিত হয় নাই, তবু কেন জানি না ইচ্ছা হয় যে, সবাইকে ডাকিয়া বলি—যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এস ওগো এস মোর হৃদয়-নীরে, হৃদয়-যমুনার পথটি চিনিয়া লও। জানিয়া লও তোমার ঐ ছোট্ট হৃদয়ই আনন্দের গুহা, অমৃতের উৎস। বিশ্বাস কর, প্রকৃতির অসীম আনন্দের একটি ধারা তোমারই হৃদয়মুখে উৎসারিত হইতে চাহে—হৃদয়কে তুচ্ছ ভাবিয়া সে-মুখে পাথর চাপা দিয়া তোমার পরম ক্ষতি তুমি করিও না।

সভা ভাঙ্গিয়াছে, বাবুরা ফিরিয়া আসিয়াছেন—যে-পথে গিয়াছিলেন সে-পথেই। প্রায় পিছনে পিছনে টিফিন লইয়া ফালতুরাও উপস্থিত হইল। পাশাপাশি দুটা সীটে সভা হইতে

ফিরিয়া কর্তারা জমাইয়া বসিলেন। কথাবার্তা সমস্তই কানে আসিতেছিল।

পরেশবাবুর সেই অদ্ভুত গলা শোনা গেল,—"জেলে এসেও সুখ নেই, স্বদেশী হয়ে যেন চোর দায়ে ধরা পড়েছি।"—হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে ঠাহর করিতে কষ্ট হইল।

একজন বুঝিয়া অথবা না বুঝিয়াই, আহ্লাদীগলায় টানিয়া টানিয়া কহিলেন—"যা বলেছেন।" পরেশবাবু ধমক দিয়া উঠিলেন,—"থাম্, দাঁত বার করলেই হাসি হয় না। এতই যদি জ্ঞানের নাড়ী টন্‌টনে তবে স্বদেশী করা কেন, বাপের সুপুত্তুর হয়ে ঘরে বসে লেখা পড়া করলেই পারতে? জেলে জ্বালাতে এয়েছ কেন?"

ব্যাপারটা এখন জলের মত পরিষ্কার হইল যে, কেন জেলে আসিয়া সুখ নাই। শুধু খাওয়া আর ঘুমানো এবং ঘুমানো আর খাওয়া—এই দুই কর্তব্য ছাড়া যে অন্য কোন হাঙ্গামা জেলে দেখা দিতে পারে, স্বদেশীদলে ঢুকিবার সময় পরেশবাবু বোধ হয় স্বপ্নেও অনুমান করিতে পারেন নাই। এখানেও ক্লাশ, এখানেও লেখা পড়া—ঠিক সেই সংসারে পিতার এলাকার ব্যবস্থার মত। ইহা হইলে মনে সুখ থাকে আর কি করিয়া।

—কি টিফিনরে কানাই?—পরেশবাবুরই প্রশ্ন।

—লুচি-তরকারী বাবু,—কানাইয়ের উত্তর।

এই গরমেও লুচি-তরকারী, যত সব ইয়ে,—যা দিয়ে যা দেখি।

যত-সব-ইয়ের পরেই দিয়ে-যা-দেখি-টুকু সকলেরই কানে, এবং মনেও, সুরসুড়ি দিয়া গেল। পরেশবাবু চটিয়াছেন নিশ্চয়, নতুবা কেন বলেন,—কোন্ আক্কেলে যে হাসেন আপনারাই জানেন। আমি বেটা এখন খালি পেটে গিয়ে খেলার মাঠে নামি, আর গুঁতোর চোটে থেঁতলা হই, এই তো আপনারা চান! যত সব বান্ধব জুটেছেন! হঠাৎ সুর বদল হইল,—আরে করে কি! সব দিয়ে দিলেন যে, আপনি খাবেন না?

বুঝিলাম কেহ হয়তো নিজের প্লেট-শুদ্ধ খাবার পরেশবাবুর প্লেটে উপুড় করিয়া দিয়া থাকিবেন। এই গরমেও যত-সব-ইয়েগুলি বিনাবাধায় এবং যথেষ্ট রুচির সঙ্গেই পরেশবাবু গিলিতে লাগিলেন, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করিলেও অনুমানে প্রত্যক্ষ করিলাম। খাইতে খাইতে পরেশবাবু প্রশ্ন করিলেন, গলার রুক্ষতা খাদ্যে কতকটা মসৃণ করিয়া আনিয়াছে বলিয়া মনে হইল,—আচ্ছা, বাংলার অতীত, ভারতবর্ষের অতীত—এসব কথা জেনে কি লাভ বলতে পারেন?

ডাঃ গুহের অদ্যকার লেকচারের বিষয়বস্তু ইহাই হয়তো ছিল।

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া নিজেই উত্তর দিলেন,—কোন লাভই নেই, এক পরীক্ষা পাশ করা ছাড়া। জীবনের কোন কাজেই লাগে না।

কোথাকার জল কোথায় গিয়া গড়ায় এই ভয়ে গোপালবাবু মিনতি করিলেন,—এখন এসব সীরিয়স্ কথা থাক, আপনার আবার খেলা আছে। পরেশবাবু কাহিল হইবার লোক নন, সঙ্গে সঙ্গেই কহিলেন,—ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। বিবেকানন্দও ঐ কথা বলেছেন। গীতাফিতা থাক, খেলার মাঠে যাও। সেখান থেকে যুদ্ধের মাঠ 'ওয়ান-ষ্টেপ-অনলি' শুধু এক পা।

এর পরেই একটা অশ্রাব্য গালি দিয়া, অশ্রাব্য হইলেও শুনিতে কিন্তু মন্দ লাগিল না, কহিলেন—বেটারা বাপের জমিদারী পেয়েছে, দু'শ বছর যায় ঘাড় থেকে নামবার নাম নেই। দুর্ভিক্ষ লাগিয়ে দিয়ে ত্রিশ চল্লিশ লাখ খুন করল, কাপড়ের অভাবে সারা দেশ আজ নাগা সম্প্রদায়, মেয়ে-ছেলেদের যা অবস্থা,—এই পর্যন্ত আসিয়া সেই পূর্বের মতই হঠাৎ কণ্ঠের পর্দার পরিবর্তন হইল,—আমাদের আবার মেয়েছেলে, আমাদের আবার ইজ্জত! একটা লোককে দেখলেন প্রতিবাদ করতে? না খেয়ে মরল লাখ লাখ লোক, অথচ একটা লোকের গায়ে হাত পড়ল না, কোথাও আগুন লাগল না। একটা ভার্সাইএর ধাক্কায় হিটলার আসে, আর পোড়াদেশে কেবল পোকামাকড়ই জন্মায় আর মরে।

বাংলার অতীত ইতিহাস—ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস বলিয়া পরেশবাবু ঠাট্টা করিয়াছিলেন কিছুক্ষণ আগে, দেখা

গেল অতীতের গর্ব রক্তে তাঁর জ্বালা ও পৌরুষ সংক্রামিত করিয়া দিয়াছে। সভা হইতে ভিতরে ভিতরে বেশ খানিকটা তাপ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছেন বোঝা গেল।

গোপালবাবু কিন্তু মোটেই বিচলিত হন নাই, বলিয়া ফেলিলেন,—বক্তৃতা দেন না কেন? বেশতো বলতে পারেন আপনি।

পরেশবাবু খেলোয়াড় মানুষ। পাঁয়তারা ঠিক আছে, সহজে বেকায়দায় পড়েন না, বলিলেন,—বলব কি! সভায় অত লোকের সামনে দাঁড়ালেই হাঁটু কাঁপে, বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে, জিভ শুকিয়ে আসে, চোখে জোনাকী দেখি। তবে পারি যদি রাগ হয়, মানে মাথায় রক্ত উঠলে বলতে পারি। তখন কাউকেই গ্রাহ্য হয় না। রাগের মাথায় বাপের মাথায় লাঠি মারা যায়, বক্তৃতা তো সামান্য কথা। কানাই, আর এক কাপ চা দে দেখি! গলা শুকিয়ে গেছে। চিনি নাই? তবে থাক্—কানাইকে ডাকিয়া কহিলাম,—নিয়ে যা, এখানে আছে।

খেলোয়াড় মানুষ, তা'ছাড়া লোকটার বিশুদ্ধ ক্রোধের এ মূর্তি আমার জানা ছিল না, বড় ভালো লাগিল।

ঘরটায় এখন একটু ভিড় কমিয়াছে। খেলার সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে। খেলোয়াড়গণ ও আরও অনেকেই গামছা কাঁধে নীচে নামিয়া গিয়াছেন, বিশেষ একটা কাজ সারিয়া শরীরটাকে হাল্‌কা করিয়া প্রস্তুত হইয়া ফিরিবেন। তাঁরাতো

প্রস্তুত হইতে গিয়াছেন, কিন্তু আমাকে পরেশবাবু আচ্ছা ফ্যাসাদের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন। না জানিয়া দুটী মারাত্মক কথা মনের ঘরে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস, বাংলার অতীত ইতিহাস—আমার ছোট্ট ঘরে তাদের হাতপা নাড়ার মত অবকাশ কোথায় ? কাজেই অস্থির হইয়া উঠিলাম।

যাকগে, যা অতীত তা অতীত। মরিয়া শেষ হইয়াছে, কবর খুঁড়িতে যাওয়া আর কেন। ভারতবর্ষের অতীত গতায়ু হইয়াছে, বাংলার অতীতও বাঁচিয়া নাই। এদের অতীত সম্বন্ধে আমার গর্ববোধ আছে, এদের বর্তমান আমাকে পীড়া দেয়, লজ্জাও দেয় কিন্তু নিরাশ করে না। আর এদের ভবিষ্যৎ ? এইখানেই আমার যত মমত্ব, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা আবদ্ধ ও মগ্ন হইয়া আছে। কোন্ জায়গায় দাঁড়াইলে ইতিহাসের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সমগ্র ছবি দেখা যায়, তা আমি জানি না। আমার সে তৃতীয় নয়নও নাই যাতে কালের কাল্পনিক বিভাগ উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিকালকে বা অখণ্ড কালকে একই সময়ে দেখা সম্ভবপর হয়। তবু মনের মধ্যে একটী আলো আছে—আশার আলো। সে-আলোতে ভারতবর্ষের—বাংলার ছবি কিছু ধরা পড়ে বৈকি। সে-দেখা সত্য কি মিথ্যা, সে প্রশ্ন অবান্তর। আমার আশা—আমার কামনা তার গর্ভে যে-ভবিষ্যৎকে ধারণ ও হৃদয়ের রক্তে পোষণ করে, তা আমার কাছে মিথ্যা নয়—যেমন মিথ্যা নয় গর্ভস্থ শিশুর অস্তিত্ব গর্ভিণী মাতার নিকট।

পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত নাকি আঠারো কি উনিশটি সভ্যতার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়াছে শুনিতে পাই। কেহ বা স্বল্পায়ু, কেহবা কয়েকটা শতাব্দীর পরমায়ু লইয়া আসিয়াছিল। নেপথ্যের যে-অন্ধকার হইতে আসিয়াছিল, সে-অন্ধকারেই ফিরিয়া গিয়াছে। মিশর, চীন, ব্যাবিলন, পারস্য, গ্রীস, রোম—প্রভৃতির গৌরবময় আত্মপ্রকাশ হইয়াছে এবং নিভিয়াছে, উৎসবশেষে রঙ্গমঞ্চের প্রদীপমালার মত।

কিন্তু ভারতবর্ষ? তার সভ্যতা কেমনে এবং কি করিয়া কালের হাত এড়াইয়া আজও ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ অব্যাহত রাখিল —ইতিহাসের সম্মুখে এত বড় প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসিত হয় নাই। এ-প্রশ্নের জবাব দিতে পারিলে, ইতিহাসেরই মূল সমস্যা শুধু নয়, মানবসমাজ ও সভ্যতারও মূল সমস্যার মীমাংসা হয়তো মিলিতে পারে।

মানুষ মরে, কিন্তু মানবধারা সমাজ-প্রবাহে অক্ষুণ্ণ ও অমর। অথচ সেই মানুষেরই সভ্যতা স্রোতের মত ধারাবাহী না হইয়া কেন যে ঢেউয়ের মত উত্থান ও পতনে সমাপ্ত হয় তারও উত্তর মিলিতে পারে। এবং কোন্ মন্ত্র গ্রহণ করিলে মানবসভ্যতা ও মানবসমাজ চলমান হইয়াও নিত্য পরিবর্তনের মধ্যেই নিত্যত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, সে-রহস্যও আয়ত্তাধীন হইবে যদি ইতিহাসের কাছে ভারতবর্ষের জিজ্ঞাসিত সে-প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারি।

নগাধিরাজ হিমালয়কে মহাকবি পৃথিবীর মানদণ্ড বলিয়াছেন। আমি নগাধিরাজকে বলিতে চাই সভ্যতার মানদণ্ড। হিমালয়কে মধ্যস্থ রাখিয়া পৃথিবীর প্রাচীনতম দুটী দেশ ও জাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী পাশাপাশি রহিয়াছে—ভারতবর্ষ ও চীন। স্মরণাতীত অতীতে যে-বন্ধন হিমালয়কে মধ্যস্থ রাখিয়া গ্রথিত হইয়াছে, তা তেমনি দৃঢ়-অটুট রহিয়াছে, সে-সম্বন্ধে শৈথিল্য, অবসাদ বা বিকৃতি স্পর্শ করে নাই। তীর্থযাত্রী, শিক্ষার্থী, জ্ঞানী, সাধক, প্রেমিক পরস্পরের শ্রেষ্ঠ সাধনার ধন বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন একে অপরের দুয়ারে। দুই হাজার বছর পূর্বে চীন বৌদ্ধমন্ত্র গ্রহণ করে, সম্রাট অশোক সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বুদ্ধের ও ধর্মের বাণী বহন করার অধিকার অর্জন করিয়া লইয়াছিলেন। বুদ্ধের বাণী চীনের মানসলোকে যে-অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাতে সমগ্র চীনকেই অনায়াসে আত্মসাৎ করিয়া লওয়া যাইত যদি বুদ্ধের দেশবাসীরা বিন্দু-মাত্র লুব্ধ হইয়া উঠিত, যদি সম্রাট অশোক রাজ্য ও সম্পত্তিকে ধর্ম ও মানবতার উপরে আসন দিতেন।

দুই হাজার বৎসর পরে ইতিহাসের অন্য প্রকাশ দেখি। খ্রীষ্টের ভক্তগণ চীনে প্রবেশ করেন বাইবেলের মোড়কে আফিং লইয়া, ক্রুশের আড়ালে বেয়নেট লুকাইয়া এবং ধীরে ধীরে শ্বেতজাতির সোনার শিকলে চীন কেমনে শতপাকে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, সে-ইতিহাসের জেরতো আজও নিঃশেষে শেষ হইতে পারে নাই। একস্থানে দেখি রাজ্যসম্পত্তিত্যাগ,

ধর্মকে গ্রহণ ও প্রচার—অন্যত্র দেখি ধর্মকে ব্যবহার রাজ্যপ্রাপ্তি ও পরস্ব-অপহরণের অস্ত্র ও উপায় রূপে। দুই সহস্র বৎসরের দুই প্রান্তের এই দুইটী ঘটনায় ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যেকার সম্বন্ধই শুধু সূচিত হয় নাই, এই দুইটী প্রাচীনজাতি ও তার সভ্যতার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যজাতি ও বর্তমান সভ্যতার মূলতঃ বিভেদ ও পার্থক্য কোথায় তাহাও সূচিত হইয়াছে। দুইটী ঘটনার মধ্যে যেমন দুই সহস্র বৎসরের ব্যবধান, দুইটী সভ্যতার মধ্যেও তেমনি বিবর্তনের বহুস্তরের ব্যবধান—ইতিহাস নিজেই দীর্ঘ দুই হাজার বছরের পরীক্ষা ও বিচারের পর সভ্যতার মূল্য ও স্বরূপ নির্ধারণ করিয়াছে এইভাবেই।

হিমালয়ের এধারে ভারতবর্ষ ও তার চল্লিশ কোটি মানব অধিবাসী, ওধারে চীন ও তার পঁয়তাল্লিশ কোটি নর-নারী,—দীর্ঘদিন পড়িয়া আছে ভাগ্যের পায়ের তলায়। প্রাচীনের নিদ্রা ও জড়ত্বের অবসান-যুগ দেখা দিয়াছে। ভাবী কালের পৃথিবীর বিরাট রঙ্গমঞ্চে এই বিরাট মহামানব-সংঘ যে বিরাট ও মহান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবে, তাহাই আমার আশার আলোকে আমি আভাসে দেখিতে পাই।

পৃথিবীর অর্ধেক মানবসমাজ হিমালয়ের দুই পক্ষপুটে লালিত ও পুষ্ট হইতেছে,—বাকী অর্ধেক মানবসমাজ হিমালয়ের সভ্যতার দান গ্রহণ করিবার জন্য আজও প্রস্তুত হয় নাই জানি, কিন্তু প্রস্তুত হইতে হইবে ইতিহাসের ইহাই অমোঘ নির্দেশ। বণিকসভ্যতার লুব্ধতার চিহ্ন সে-দানের মধ্যে

নাই, শক্তিমানের জয়স্তুতিও সেখানে নাই—এটুকু সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। শান্তির—মানবতার—একাত্মতার কী বীর্যবান আনন্দ-রসধারা পৃথিবীর তৃষ্ণাতুর অঞ্জলি ছাপাইয়া বর্ষিত হইবে সেদিন, ভাবিতেই বুক আমার ভরিয়া উঠে—কাঁপিয়া উঠে। জানি, হিমালয় যাদের মধ্যস্থ, যাদের পালক ও পোষক, হিমালয়ের মতই তারা স্বভাবে স্থির ও অনড় থাকিবে, মাথা তাদের ইতিহাসের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে নিত্য উদ্ধৃত ও সমুন্নত থাকিবে হিমালয়ের অভ্রভেদী শিখরচূড়ার মত।—ইহাই আমার আশা, ইহাই আমার স্বপ্ন। ভারতবর্ষ ও চীনের প্রাণে ও মনে, জীবনে ও কর্মে হিমালয় আকার লাভ করুক, ভাষা গ্রহণ করুক—জীবনবান হউক।

হিমালয়কে ও ইতিহাসের এই স্বপ্নকে যিনি সার্থক করিবেন সেই অনাগত মহামানবের জন্য আমার প্রণাম রাখিয়া গেলাম কারাগৃহের এই ধূলিতলে।

বাংলা ?

বাংলাই এই স্বপ্নের সাধনাগার। বীজকে বাদ দিলে বৃক্ষের যে-অবস্থা, উৎসমুখ উহ্য হইলে নদীর যে-পরিণাম, ভিত্তিমূল অপসারিত হইলে সৌধের যে-দুর্গতি—এই স্বপ্নেরও তেমনি অবস্থা হয় যদি বাংলাকে সরাইয়া লওয়া হয়। ইতিহাসের এ-স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থাকিয়া যায় তবে।

'সোনার বাংলা তোমায় আমি ভালবাসি'—এই জোরেই কি এত বড় দুঃসাহসিক কথা বলিয়া ফেলিলাম, না, তা নয়।

সত্য যা দেখিয়াছি তাই কলমের মুখে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আমার আশার আলোর কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সেই আলোতেই বাংলার এই ভবিষ্য ছবি আমার চোখে পড়িয়াছে।

হিমালয়কে আমি সভ্যতার মানদণ্ড বলিয়াছি, সেই হিমালয়ই ভারত ও চীনের মধ্য দিয়া ইতিহাসের বিরাট রঙ্গমঞ্চে সভ্যতার নূতন খেলা খেলিবে, এও আমি বলিয়াছি। সেই হিমালয়ের স্বপ্নের সাধনাগার বাংলাদেশ কেমন করিয়া হইতে পারে, এ-প্রশ্নের জবাব দিবার আগে অন্য কয়েকটা কথা বলিয়া লওয়া আবশ্যক।

বর্তমান ভারতবর্ষ বলিতে যা বুঝি, তা অতীতের বাংলার দান বা সৃষ্টি। বর্তমান ভারতবর্ষের প্রধান দুটী বিশেষ পরিচয়— প্রথম, দেশাত্মবোধ বা আত্মসচেতনতা অথবা জাতীয়তা। তা এই বাংলারই হৃদয়-উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া ক্রমে সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। দ্বিতীয় পরিচয়—আধুনিক বা পাশ্চাত্ত্য অথবা বৈজ্ঞানিক সভ্যতা। বাংলাই ভারতের হইয়া এই সভ্যতাকে প্রথম গ্রহণ করে এবং অন্যান্য প্রদেশ বাংলার শিখা হইতে ধীরে ধীরে আপন প্রদীপে আলো জ্বালাইয়া লয়। অতীতের বাংলাই বর্তমানের ভারতবর্ষে জীবন ও রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

বর্তমান বাংলার তবে আজ এ-দশা কেন? কেন ভারতবর্ষের ইতিহাসে আজ সে এমন অখ্যাত অংশ গ্রহণ করিয়াছে?

ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই বাংলাকে সাময়িক অবলুপ্তিতে প্রচ্ছন্ন থাকিতে হইতেছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ সমস্তরে না আসা পর্যন্ত পথের মধ্যে তার অপেক্ষা করিবার ঐতিহাসিক নির্দেশ আছে। তাই বর্তমান বাংলার ছবি এই শতাব্দীর প্রথমভাগের বাংলার তুলনায় এত ম্লান, নিস্তেজ ও ছায়াচ্ছন্ন।

মাটির দুয়ার খুলিয়া কেহ যদি বাংলার গোপনঘর উঁকি মারিয়া দেখিয়া লইতে পারিত, তবেই খবর আমরা পাইতাম সেখানে কি আছে এবং কিসের আয়োজন চলিতেছে। ঐ গোপনঘর হইতে দুইটী ধারা বাহির হইয়া প্রকাশ্যে পথ করিয়া চলিয়াছে। রামমোহন হইতে সুরু করিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দ পর্যন্ত একটী ধারাকে প্রবহমান দেখি। অতীতের ভারতবর্ষের যে-জ্ঞান যে-আলো যে-অমৃতবাণী ছিল, তাহাকেই এই ধারাপথে আসিতে দেখিতেছি নূতন রূপে। প্রাচীনই নবীন হইয়া আসিতেছে আবার।

আর একটি ধারাপথ ধরিয়া চলিয়াছে বীরের ও কর্মীর দল—কানাইলাল-ক্ষুদিরাম হইতে সুরু করিয়া সূর্য সেনের সীমানা উত্তীর্ণ হইয়াও এ-ধারা চলিয়াছে।

বাংলার গোপনঘরে কি আছে আমি জানি না, কি সে চাহে তাও আমি জানি না, শুধু জানি একই ঘর হইতে জ্ঞানী ও বীরের দল অথবা আলো ও শক্তি বাহির হইয়া দুই পথ ধরিয়া চলিয়াছে। এই দুই ধারা যখন যুক্ত হইবে, সেদিনই বাংলার প্রাণের ও আত্মার আপন অভিলাষটি সত্য রূপ নিবে। তাহাই

ভবিষ্য ভারতের বাণী পৃথিবীর দরবারে, তাহাই হিমালয়ের সভ্যতা ভাবী কালের ইতিহাসে।

হিমালয়ের হৃদয়-রস মানস-পাত্রে পর্বত-প্রাচীরবেষ্টনীতে গোপনে সুরক্ষিত উর্ধ্বলোকে ধূলির পৃথিবী হইতে। সেই মানস সরোবর হইতে হিমালয় জল হইয়া ভারতবর্ষের প্রান্তরে নামিয়া আসিয়াছে—সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের তিনটী স্রোতের ধারা-পথে। তাই, সপ্তসিন্ধুতীরে ব্রহ্মাবর্তের সভ্যতা আমরা দেখিয়াছি, গঙ্গার কূলে আর্যাবর্তের সভ্যতাও দেখিয়াছি,—তা হিমালয়েরই সভ্যতা বা আত্মপ্রকাশ। হিমালয়ের মানসরস সিন্ধু ও গঙ্গার তীরে তীরে এমন ঐশ্বর্যে—সভ্যতায় মূর্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের ধারাপথে হিমালয়ের যে-হৃদয়রস উদ্দাম স্রোত হইয়া প্রবাহিত, তার তো কোন প্রকাশ আজ পর্যন্ত দেখা দেয় নাই! সিন্ধুর সভ্যতা আসিয়াছে, গঙ্গার সভ্যতাও আসিয়াছে—কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের সভ্যতার আবির্ভাব এখনও বাকী আছে। তাহাই ভারতের ভাবী সভ্যতা—হিমালয়ের দান।

সিন্ধু ও গঙ্গা নাতিদীর্ঘ গিরিপথ পার হইয়া সমতটে নামিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রকে দীর্ঘপথ গোপনে আসিতে হইয়াছে দুর্গম জটিল গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া, তবে সে সমতট স্পর্শ করিয়াছে। এবং পরিপূর্ণ বিস্তার লাভ করিয়াছে এই বাংলারই প্রান্তরে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, সিন্ধু ও গঙ্গার মিলন হয় নাই। কিন্তু বাংলায় আসিয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এই দুইটী মানস-ধারাকে মিলিত করা হইয়াছে। এই মিলনের যে-গূঢ় গোপন উদ্দেশ্য,

সে-রহস্যই ভাবী ইতিহাসে ক্রমে ক্রমে উদ্ঘাটিত হইতে থাকিবে।—এই স্বপ্নই আমি দেখি ও দেখিতে পাই।

প্রশ্ন হইবে, এই ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসের কি-ই বা যোগ থাকিতে পারে? ভূগোল তো ইতিহাস নয়।

কে বলে ভূগোল ইতিহাস নয়? একই স্বপ্ন যখন স্থানে রূপ নেয় তখন পাই ভূগোল, আর সে-স্বপ্নই যখন কালে রূপ নেয় তখন পাই ইতিহাস। একই স্বপ্নের দুই ছবি—ভূগোল আর ইতিহাস। স্থান ও কাল হরগৌরী সম্বন্ধে নিত্য যুক্ত, ভূগোলে ও ইতিহাসে আসার আগে ইহারা এক—অদ্বৈত। তাই, ভূগোলে যা পূর্বে রূপ নেয়, তাহাই আবার ক্রমে ইতিহাসে আকার গ্রহণ করে।

বাংলাতে আসিয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের আবার মিলন হইয়াছে, যেমন মিলনে ইহারা আদিতে মানসসরোবরের বুকে এক হইয়া ছিল। এই মিলন আকস্মিক ঘটনা নয়। যে-স্বপ্ন স্থানের আড়ালে গূঢ় গোপনভাবে কাজ করে, তারই নির্দেশে এই মিলন। দুই ধারারই শুধু মিলন নয়, পৃথিবীর সমস্ত দ্বৈত ও দ্বন্দ্বের মিলন-ইতিহাসেরই ভৌগোলিক রূপ ও সংকেত ইহা। ইহাই হিমালয়ের ভাবী স্বপ্ন এবং বাংলাই সে-স্বপ্নের সাধনাগার। আমার সোনার বাংলার এই জ্যোতির্ময় ভবিষ্যতই আমার মানসদৃষ্টিতে আমি দেখিতে পাই।

মাঠে বাঁশি বাজিয়া উঠিয়াছে। এখনই খেলা সুরু হইবে, প্রায় সকলেই নীচে নামিয়া গিয়াছেন। মাঠে যাইতে ইচ্ছা করিতেছে না, ডেক চেয়ার ছাড়িয়া ওধারে পূবের জানালায় গিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিলাম। জানালার নীচেই মাঠ; মাঠের পরে পুকুর, পুকুরের পরে জেল গেট ও অফিস। চোখ ভালো থাকিলে এখান হইতেই অফিসের মধ্যে লোকজনের চলাফেরা দেখা যায়।

খেলোয়াড়গণ যার যার স্থান গ্রহণ করিয়াছে, আর স্থান গ্রহণ করিয়া আছে মাঠের মধ্যেই উত্তরে ও দক্ষিণে অতিবৃদ্ধ দুটী বটবৃক্ষ, যেন দুই পক্ষের দুইজন ব্যাক। অহরহঃ বল ঠেকাইয়া দিয়া এক পক্ষের সুবিধা অপর পক্ষের অসুবিধা সৃজন করিয়া থাকে এবং একস্থানে একপায়ে দাঁড়াইয়াই নিরাসক্তভাবে করিয়া থাকে, পক্ষপাতিত্বের দোষ দিবারও উপায় নাই।

বাঁশিওয়ালা বাঁশি বাজাইয়া দিল। জেলে খেলার বাঁশি 'নট এলাউড,' আমাদের থিয়েটার পার্টির পিতলের লম্বা বাঁশিটা কখনও মুখে কখনও হাতে লইয়া রেফারীকে কাজ চালাইতে হয়—খেলা সুরু হইয়া গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দর্শকদের চীৎকারে এবং খেলোয়াড়দের নৈপুণ্যে খেলাটা হইয়া দাঁড়াইল একেবারে 'কুরুক্ষেত্তর লড়াই'। সে কী খেলা! না দেখিলে লিখিয়া বা বলিয়া বুঝানো অসম্ভব। অতএব, সে রোমহর্ষক ক্রীড়ার বর্ণনার চেষ্টা ছাড়িয়া দিলাম। মনে ক্ষোভ রহিয়া গেল যে, আপনারা এদেশে থাকিয়াও এমন

খেলাটা দেখিতে পারিলেন না! মনে মনে ভাবিলাম এবং ভাবিয়াই শিহরিয়া উঠিলাম,—খেলার নামেই যাদের এই মূর্তি, তাও আবার নিজেদের মধ্যেই, তাদের যদি ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রহাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে? থাক্, দুঃস্বপ্ন দেখিয়া লাভ নাই। চোখের সমুখ দিয়া যেন বহুদিনের দীর্ঘ উপবাসী একদল ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছুটিয়া চলিয়া গেল,—দুর্গা, দুর্গা, মানুষের মধ্যে এ কোন্ শিকলে-বাঁধা জন্তু অন্ধকারে গুটি মারিয়া পড়িয়া আছে!—একটা হৈ-হৈ জয়ধ্বনি উঠিল, ব্যাপার কিছুই নয়, একই সময় বল হেড্ করিতে গিয়া দুই বিরুদ্ধ বীর ধরণীতলে লম্বা হইয়াছেন, তাই এমন পরম উল্লাস!

উৎসাহে ওধারের দর্শকগণ লাইন ছাড়িয়া মাঠের মধ্যেই ঢুকিয়া পড়িয়াছে। রেফারী হাত নাড়িলেন, লাইন ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইবার সিগন্যাল ওটা। কিন্তু দর্শকদের তা গ্রাহ্য করিবার মত অবস্থা নয়। লাইনস্‌ম্যান তাঁতের মাকুর মত লাইন ধরিয়া রুমালহাতে এধার-ওধার ছুটাছুটি করিতেছিল। ভীড়ের কাছে আসিতেই কহিল,—লাইন ছাড়ুন, সরে দাঁড়ান। বলিয়া নিজের হুকুম নিজেই কার্যকরী করিবার কাজে লাগিয়া গেল। শান্তি ঘোষকে জনতার পুরোভাগে পাইয়া বুকে ও কাঁধে হাত দিয়া পিছনে ঠেলিয়া নিতে লাগিল, যেন বাঁশ দিয়া পুকুরের পানা ঠেলিতেছে এমনি উৎসাহে ও ষ্টাইলে।

শান্তি ঘোষ দুই হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—বন্দেমাতরম এবং আসল সত্যাগ্রহীর মতই ধাক্কার গুঁতায়

অনিচ্ছায় পিছাইয়া আসিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে জনতাও গর্জন করিয়া উঠিল—বন্দেমাতরম।

মাঠের খেলোয়াড়গণ ও বাহিরের দর্শকগণ উভয় সম্প্রদায়ের রক্ত বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে। এক কর্ণার-কিকের সময় বিপক্ষের গোলরক্ষকের উপর নেপাল বাড়ুজ্যে হনুমান-লম্ফে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাকে পলোচাপা দিয়া ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল। রেফারী বাঁশিতে জোর ফুঁ দিলেন, দর্শকগণ রে-রে করিয়া উঠিলেন, কাঁচাপাকা দাড়ি ও মাথায় প্যাগর শিব সিং তিড়িং তিড়িং নৃত্যে লম্বা পা ফেলিয়া দৌড়াইল, মুখে তৃপ্তির হুঙ্কার—বরো বালো খেল হোচ্ছে বাবা। পাঞ্জাবী শিখ, স্বদেশীই করে নাই, বাংলাটাও আয়ত্ত করিয়াছে। আগাইয়া গিয়া গোল রক্ষককে টানিয়া তুলিল, কিস্‌সু অয়নি, ঠিক আছে বাবা, লেও একটো লেবু খা লেও, বলিয়া পকেট হইতে সত্যই লেবু বাহির করিল। গোল রক্ষক ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিল, থাক, দরকার নাই।

শিব সিং কহিল,—আমি করছে বাবা, তুমি খাড়া রহ, বলিয়া তার পাঞ্জাবী হাতে যা ঝাড়ন দিল, গায়ে জামা না থাকিলে গোল রক্ষকের গায়ের চামড়া লইয়াই টান পড়িত।

গোল রক্ষক সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—হয়েছে সর্দারজী আর না।

বালো খেল হচ্ছে বাবা, বলিয়া শিব সিং সেই তিড়িং তিড়িং নৃত্যে আবার মাঠের কিনারা ধরিয়া ছুটিয়া চলিল। বল

যে দিকে যায় শিব সিংও সেদিকে যায়। মুখে সেই একই বুলি —বড় বালো খেল হচ্ছে বাবা, সাবাস নেপাল দা।

কিন্তু এহেন 'বালো খেলটা' শেষ পর্যন্ত শেষ হইতে পারিল না, মাঝপথে স্থগিত রাখিতে হইল।

পুকুরের ঐপারে জেল গেটের সামনে ছোট্ট একটী ভীড় জমিয়াছে, জেলার, জনকয়েক সার্জেণ্ট ও সিপাহীও আছে, আর স্বদেশী বাবুরা কয়েকজন। খেলার দর্শকদের মধ্যেও অনেকেই দ্রুতপায়ে আগাইয়া গেলেন। কয়েকজনে ফিরিয়া আসিয়া কি খবর দিলেন, রেফারী খেলা থামাইলেন এবং খেলা বন্ধ হইতেই একে একে সকলেই জেল গেটের ঐ ভীড়ে গিয়া যোগ দিলেন। চুয়াল্লিশ ডিগ্রীতে দু'জন বন্দী ছিলেন, একজন পাঞ্জাবী, অপর জন বাঙ্গালী। শত্রুর সাবমেরিণে ভারতবর্ষের উপকূলে নামিয়া প্রচারকার্যের জন্য ধৃত হইয়াছেন। ক্যামাক ষ্ট্রীটে এক বাড়ীতে ইঁহাদের বিচার গোপনে চলিতেছিল, আজ বিচারের রায় দেওয়া হইয়াছে,—ইঁহাদের ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। দণ্ডাদেশ শুনিয়া উভয়ে এই মাত্র কোর্ট হইতে জেলে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁদের চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর সেলে লইয়া যাওয়ার পথেই এই ভীড়।

অতি পুরাতন কথা, কিন্তু একেবারে নূতন হইয়া বুকে ধাক্কা দিল। এই প্রেসিডেন্সি জেল, দুই সহস্র কয়েদী ও অফিসারদের মধ্যে মাত্র দুইজন ইংরাজ, জন সাতেক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট, বাদ বাকী আমরা সকলেই ভারতবাসী। আমাদের মধ্যেই, আমাদের চোখের সামনেই এবং আমাদেরই হাতে

পরানো দড়িতে ইঁহাদের শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিতে হইবে। চোখের সামনে ভারতবর্ষের ছবি ভাসিয়া উঠিল। সমস্ত দেশটাই যাদুমন্ত্রে মোহাচ্ছন্ন হইয়া আছে,—এত বড় দেশ, এত বড় যার জন-সম্পদ। সামান্য কয়েকজন বিদেশীর ভেল্কীতে আফিংখোরের মত গোটা দেশটাই নেশাচ্ছন্ন হইয়া আছে। এদেশে কি এমন একটা মানুষ নাই, যে হিমালয়ের চূড়ায় দাঁড়াইয়া খুব জোরে একবার হো-হো অট্টহাসি দিতে পারে? পারিলে, এ মায়ামন্ত্র, এ নেশা এক মুহূর্তেই ছুটিয়া যাইত।

মনের গ্লানি ও চাঞ্চল্যে চেয়ার ছাড়িয়া নিজের সীটে ফিরিয়া আসিলাম, জানালায় গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইলাম।

সম্মুখের পশ্চিম আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেই মনের ভিতর আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়া গেল,—এজন্য মোটেই আমি প্রস্তুত ছিলাম না। মনের গ্লানির চিহ্ন পর্যন্ত নাই, পূর্ব-মুহূর্তের ক্ষোভ বিদ্বেষ চাঞ্চল্য কোথায় সরিয়া গেল, কে জানে! বড়লাটের বাড়ীর গাছপালার পিছনে সূর্য ঢাকা পড়িয়াছে, চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অস্তসূর্যের আলোতে সমস্ত আকাশটা রংয়ে রঙ্গীণ হইয়া গিয়াছে। এত ক্ষমা—এত প্রশান্তি আকাশে! ঋষি বলিয়াছেন, আকাশে যদি আনন্দ না থাকিত তবে কেই বা প্রাণ ধারণ করিত। ইহাই কি রুদ্রের সেই কল্যাণতম আনন্দমূর্তি? ইহাই কি সেই "চির-দিবসের শান্ত শিবের বাণী?" কে জানে, কিন্তু সমস্ত মন যেন আর্দ্র হইয়া আসিল।

রাত নয়টা।

কিছুক্ষণ আগে সার্জেণ্ট ও সিপাহী আটঘরে আমাদের বন্দীদের সংখ্যা গণনা শেষ করিয়া দুই সিঁড়ির দরজায় তালা দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঘরে যথারীতি তাশপাশা, দাবা ও মাজং-এর আসর বসিয়াছে। নৈশ ভোজন সমাপনান্তে বাবুরা কাজে লাগিয়াছেন। রাত এগারোটা অবধি এই ক্রীড়া সমান চলিবে। মাজং-এর আড্ডাটা সব চেয়ে শেষে ভাঙ্গে, কোন কোন দিন রাত বারোটাও প্রভুরা পার করিয়া দেন,—এই উৎসব শেষে বাতি নিবাইয়া যে যার শয্যা নিবে। ভোরে জাগিয়া আবার তেমনি একঘেয়ে আর একটা দিন সুরু করিবে—মাসের পর মাস এইভাবে একটা দিনের উপরই বন্দীরা দাগা বুলাইয়া চলিয়াছে এবং এইভাবেই কয়েকটা বছর আসিল, গেল এবং যাইবে।

ইলেকট্রিক বাল্‌বটা খুলিয়া লইয়া আমার পর্দাঘেরা ঘরটা অন্ধকার করিয়া লইয়াছি। ডেক চেয়ারটা টানিয়া একেবারে জানালার কাছে আনিয়া পা ছড়াইয়া দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি।

প্রথমেই মনে হইল, দিনের পৃথিবী ও রাতের পৃথিবী একই পৃথিবী হইয়া কত আলাদা। দুইয়ের মধ্যে যেন কোন সাদৃশ্য কোন মিল নাই—এরা এক হইয়াও দুই। দিনের রৌদ্রে সমস্তই অনাবৃত, বড় বেশী প্রকাশিত ; গাছপালা, পশুপক্ষী, মানুষ প্রত্যেকেই নিজ নিজ রূপে ও চরিত্রে অতি স্পষ্ট এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশিষ্টতায় স্বতন্ত্র ও পৃথক। এই অসংখ্য

বিভিন্নের ঘাত-প্রতিঘাতে দিনের পৃথিবী এমন সংঘর্ষময়, এমন নিদারুণ। সূত্রছেড়া ছড়ানো মণির মতই তাই দিনের পৃথিবীকে অনেক সময় মনে হয় উদ্দেশ্যশূন্য, কোন লক্ষ্য বা অর্থই যেন এর নাই—বিকারের রোগীর জ্বরতপ্ত মস্তিষ্কের প্রলাপেরই জীবন্ত ছবি যেন এরা।

কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে পৃথিবীর সেই হারানো সূত্রটী অলক্ষ্যে ফিরিয়া আসে, অন্ধকারের পটভূমিকায় সব কিছুকেই একত্রে গাঁথিয়া লয়। ফলে, এই একক অন্ধকারে পৃথিবীতে সেই শান্তি খুঁজিয়া পাই, দিনের রৌদ্রে যা ছিল শুধু মরীচিকা, যার পিছনে তৃষ্ণাতুর মরুমৃগের মত পৃথিবী ছুটিয়া মরিয়াছে। এখন যেন কতকটা বুঝা যায় পৃথিবী অর্থহীন প্রলাপ মাত্র নয়, এর সত্যিকার একটী অর্থ একটী উদ্দেশ্য কোথাও গোপন আছে,—দিনের আলোয় তা সরিয়া যায়, রাত্রের আকাশ পৃথিবীজোড়া অন্ধকারের মধ্যে তা আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু কেন এমনটী হয় ঠিক বুঝিতে পারি না। হয়তো একের বৃন্তে ধরিয়া পৃথিবীকে দেখি না বলিয়াই এমন হয়। সেই একের বৃন্তে বা একের আকাশে দেখিবার সুযোগ এই অন্ধকারের মধ্যেই পাওয়া যায়। এক বিশ্বজোড়া অন্ধকার, আর তারই মধ্যে একটী পৃথিবী। ভালো লাগিতেছে, না মন্দ লাগিতেছে, কিছুই বুঝিতেছি না। অন্ধকার যেমনভাবে পৃথিবীকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, তেমনিভাবে আমার মন হয়তো পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে; অন্ধকারে যেমন সব একাকার, আমার মনেও হয়তো তেমনি সব

একাকার হইয়া মিশিয়া আছে, ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সীমা-রেখা মুছিয়া ফেলিয়া।

আবার মনে হয়, তা নয়,—সম্মুখে অন্ধকারের পর্দায় গূঢ় রহস্যের বিচিত্র সঞ্চরণ ছায়াছবি ফেলিয়া চলিয়াছে—আমার মন যেন একক দ্রষ্টা নির্বিকার চোখে তা দেখিয়া চলিয়াছে। নিজের মনকে দ্রষ্টা বলিতেই একটী প্রশ্ন কে যেন মনকে জিজ্ঞাসা করিল,—এ পৃথিবীর আসল রূপটী কি বলিতে পার ? প্রশ্নটাকে পাশে লইয়াই যে মন আমার ঐ সম্মুখের পর্দায় ছবি দেখিতেছিল, আগে তা টের পাই নাই। এখন টের পাইলাম, মন আমার সত্যিকার দ্রষ্টা নয়, দ্রষ্টার দৃষ্টির পাশে কোন প্রশ্ন কোন সমস্যাই সঙ্গিনী হইয়া আসন নিতে পারে না। দ্রষ্টা চিরকালই সঙ্গিহীন একা—যেমন একা বাহিরের ঐ অন্ধকারের অসীম পটভূমিকা।

আচ্ছা, এ পৃথিবী নাকি কোন স্মরণাতীত কালে সূর্যের সঙ্গে একাকার হইয়া ছিল তার বহ্নিবাষ্পের মধ্যে ! কেহ খবর জানে না কবে একদিন মহাশূন্যে ধাবমান সূর্যের অঙ্গ হইতে চ্যুত হইয়া পড়ে তারই খানিকটা বহ্নিময় অঙ্গ। কোটি কোটি আলোক বৎসর পরে তাকেই আজ দেখি পৃথিবীরূপে। যাকে ধূলামাটির পৃথিবী বলি আসলে তবে সে তা নয়। আদিতে যা ছিল সূর্যবহ্নি, অন্তেও নিশ্চয় সে তাই,—মাঝখানে দেখা দিল এ কী বিচিত্রতা ! অন্ধকারে যে-পাহাড় আকাশে

মাথা তুলিয়া আপন মহিমায় স্তব্ধ হইয়া আছে, আর যে-সাগর অন্ধকারে অশ্রান্ত তরঙ্গে উদ্বেল ও মুখর হইয়া আছে,—এরা তবে একই, একই সূর্যের আগুনের রূপান্তর? ঘুমন্ত শিশুমুখে যে-হাসি, আর যে-মা স্নেহভরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাকে চুম্বন করিতেছেন—উভয়েই তবে এক? অন্ধকারে যে-পথিক চলিয়াছে, আর পিছনে যে-আততায়ী আস্তিনে ছুরি লুকাইয়া সন্তর্পণে আসিতেছে,—কোন ভেদই নাই, উভয়েই তো এক? এই যে আমার শরীর, এ সূর্যের আলোর পুঞ্জিত আকার: আমার নাড়ীতে যে-রক্তের সঞ্চলন, তা সূর্য-রশ্মিই তরল পরিণাম! এই যে আমার চিন্তাগুলি, এই যে আমার মন, আর এই যে আমি স্বয়ং নিজে—কোন ভেদ, কোন পার্থক্য নাই, এক একেবারে এক। সূর্যের উৎস হইতে উৎসারিত স্মরণাতীত প্রথম প্রত্যূষে। এ কী রহস্য? এক সূর্যের আলোই শেষে জড়জগৎ, অরণ্যজগৎ, জীবজগৎ মনোজগৎ সমস্ত কিছুতে রূপান্তরিত হইয়া গেল!

এখানেও তো দেখিতেছি অন্ধকারের মত সেই একই রহিয়াছে। তবে তো দিনের পৃথিবী অর্থহীন প্রলাপ নয়,—এরও একটী একত্বের সূত্র আছে যাতে সব কিছু গ্রথিত। অন্ধকারের একত্বে প্রকাশ নাই, কিন্তু এই আলোর একত্বে বহুত্বও প্রকাশিত এবং স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত,—তথাপি সেই একত্বের বিন্দুমাত্র হানি হয় না। একি শুধু আমার বুদ্ধির দেখা,

না সত্যই সত্য? এক একই সময়ে একও রহিয়াছে, আবার বহুও হইয়াছে,—এ কী অসম্ভব সত্য!

আমরা তবে এ-সত্যে থাকিয়াও সত্যচ্যুত কেন হইলাম? হয়তো সূর্য হইতে বহু বহু আলোক বৎসর দূরে ও ব্যবধানে সরিয়া আসিয়াছি বলিয়া এমন হইয়াছে। আবার এও তো সত্য যে, পৃথিবী যদি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া না লইত তবে নিজেকে তার পাওয়া হইত না, আমাদেরই বা আমরা পাইতাম তবে কেমনে? সরিয়া আসিয়াছি তাই আমরা আমরা হইয়াছি। একেবারেই কি সরিতে পারিয়াছি? না, তাও তো পারি নাই। সূর্যকেন্দ্রে এই সূর্যসঙ্গিনী বাঁধা পড়িয়া আছে, আবার সূর্যপ্রদক্ষিণের গতিপথে অসীম মুক্তিও পাইয়াছে। সূর্যধাতুতে-গড়া দেহ, সূর্যরসেই আবার সঞ্জীবিত—একটী প্রকাণ্ড সূর্যমুখী ফুলের মত মুখ তুলিয়া চাহিয়া আছে সূর্যেরই দিকে। সূর্য দিয়াছে আলোক চুম্বন, সুন্দরী সূর্যসঙ্গিনী সেই চুম্বনকে ধরিয়া রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের রঙীণ মদিরায় আপন দেহপাত্রে। বিচ্ছিন্ন তো একেবারেই হয় নাই, দান-প্রতিদানের জোয়ার-ভাঁটা নিত্য চলিয়াছে ঐ আকাশ-গাঙ্গের দুই তীরে,—সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে।

আমরা জানি না বটে, তবু এই দান-প্রতিদানের ছন্দে আমরাও বাঁধা পড়িয়াছি। আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব এই সুরেই বাঁধা,

পৃথিবীর অণুতম ধূলিটী পর্যন্ত,—এই সৌরছন্দে। বৈদিক ঋষিও এই কথাই বলিয়াছিলেন, আজ যেন কিছু কিছু অর্থ তার বুঝিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন—হে পূষণ, হে এক, হে ঋষি, তোমার হিরণ্ময় আবরণ অপসারিত কর, তোমার মধ্যে যে-সত্য তাঁকে দেখি, সে-সত্য আমিই।

আলোকও সত্য নয়, জ্যোতিও সত্য নয়, তেজও সত্য নয়। আলোকের আবরণে সে-সত্য ঢাকা, জ্যোতির আচ্ছাদনে তা আবৃত এবং তেজের পাত্রে তা গূঢ় ও গোপন। তাইতো ঋষির প্রার্থনা এই আবরণ উন্মোচনের।

হঠাৎ কানে আসিল—We must do something.

আমার ঠিক বিপরীত দিকে পূবধারের সীটে কমিটির জরুরী সভা বসিয়াছে। নেতৃস্থানীয়দের লইয়া আমাদের এই কমিটি গঠিত। আমাদের জেল-জীবনের সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা ও দেখাশুনা করা এই কমিটির দায়িত্ব। বিশেষ একটী জরুরী বিষয়ের আলোচনা চলিতেছিল। ব্যারিষ্টার ঘোষচৌধুরীর গলা, তিনিই আলোচনা প্রসঙ্গে একটু উত্তেজিতকণ্ঠে বলিয়া ফেলিয়াছেন—We must do something.

কিন্তু কি করিবেন অথবা করিতে পারিবেন, আমিতো ভাবিয়া পাই না! জেলখানার দেয়ালে নিষ্ফল ক্রোধে মাথা কুটিয়া

মরা ছাড়া করিবার মত অন্য কিছু তো আমার বুদ্ধিতে আসে না। ব্যারিষ্টার সাহেবের এই উত্তেজিত উক্তিও সেই পাথরে মাথা কুটিয়া মরা নিষ্ফল ক্রোধেরই একটা শাব্দিক অভিব্যক্তির অধিক কিছু আমার কাছে মনে হইল না।

ক্রোধের অবশ্য কারণও ছিল। দিনকতক আগে খবর আসে যে, বিমলবাবুর স্ত্রীর হঠাৎ গলা দিয়া প্রচুর রক্ত পড়িয়াছে। ডাক্তারেরা বলেন যে, সীরিয়াস টাইপের যক্ষ্মা। সরকারের নিকট চিকিৎসার জন্য অর্থ সাহায্য চাওয়া হয়, সে আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে ভদ্রলোক কয়েকদিনের ছুটি প্রার্থনা করেন, সে আবেদনও অগ্রাহ্য হয়। বাহিরের বন্ধুদের চেষ্টাচরিত্রের ফলে ভদ্রমহিলা যাদবপুর হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছেন। গতকাল খবর আসিয়াছে যে, তাঁহার অবস্থা নাকি অত্যন্ত খারাপ, যে কোন সময়ে মারা যাইতে পারেন। মেয়ে খবর দিয়া গিয়াছে। শেষ সময়ে পিতা যাহাতে মাতার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত থাকিতে পারেন, অন্ততঃ ঘণ্টাকয়েকের জন্য যাহাতে ছুটি পান, মেয়েটী গোয়েন্দা অফিস রাইটার্স বিল্ডিংএ ঘুরিয়া সারাদিন চেষ্টা করিয়াছে; নাওয়া-খাওয়ার সময় পর্যন্ত পায় নাই। কিন্তু দেশী বা বিদেশী কোন অফিসারই এই দুঃখে বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়া দরকার বোধ করেন নাই।

প্রধান মন্ত্রীকেও ধরা হইয়াছিল। পুলিশ ছুটি দিতে রাজী হইতেছে না। এটুকুই শুধু তাঁহার কাছে জানা গেল। অর্থাৎ,

বাংলার গোয়েন্দা পুলিশের অমতে ঘণ্টাকতকের ছুটি মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা বাংলার প্রধান মন্ত্রীরও নাই, স্পষ্টতঃ স্বীকার না পাইয়াও প্রকারান্তরে ইহাই তিনি জানাইয়া দিলেন।

প্রেসিডেন্সি জেল হইতে যাদবপুর মোটরে আধঘণ্টার রাস্তাও নয়। পুলিশ পাহারায় বিমলবাবুকে সেখানে লইয়া যাওয়া ও ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা করাও তেমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। অথচ, বাংলার গোয়েন্দা পুলিশ এই সামান্য ব্যবস্থাটুকুতে সম্মত হইতে প্রস্তুত নহেন। এত নিকটে থাকিয়াও স্ত্রীর শেষ সময়ে একবার উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না—বিমল-বাবুর মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকানো যায় না। চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, দৃষ্টিতে একটা অসহায় ভাব। দৃষ্টির এই অসহায় ছানিটুকু সরাইলে ভিতরে কি দেখা যাইত, তাহা ভগবানই জানেন।

মেয়ে জানাইয়া গিয়াছে যে, মাতাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়া আসিয়াছে, বলিয়াছে যে, ছুটির ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, পিতা ঘণ্টাকতকের মধ্যেই আসিয়া পড়িবেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি এখন আশা লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন স্বামী আসিয়া পাশে দাঁড়াইবেন। সন্ধ্যার কিছু পরে এডিসন্যাল জেলারকে দিয়া গোপনে হাসপাতালে ফোন করানো হইয়াছিল। উত্তর আসিয়াছে যে, অবস্থা খারাপ, রাত্রটা নাও কাটিতে পারে। ভগবান না করুন, যদি তাই হয় তবে মৃত্যুর

বন্দীর প্রশ্ন

শেষ মুহূর্তটী পর্যন্ত বৃথা আশা ও প্রতীক্ষা করিয়া ভদ্র-মহিলাকে চোখ বুঁজিতে হইবে। সেই মুহূর্তটার পরে গিয়া হাজার ডাকিলেও তিনি সাড়া দিবেন না বা চোখ মেলিয়া চাহিবেন না।—

কমিটির অলোচনা শেষ হইয়াছে, দুই একজন করিয়া উঠিয়া পড়িতেছেন। কি সিদ্ধান্ত ইঁহারা স্থির করিলেন, জানি না। কিংবা আদৌ কোন সিদ্ধান্ত কিছু করিতে পারিলেন কি না তাও জানি না। যাদবপুর হাসপাতালের একটি কক্ষে শয্যাসীন একটি ব্যাকুল প্রতীক্ষার ছবিই বার বার মনের সামনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মৃত্যু ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে, তার পায়ের শব্দও যেন কানে শুনিতে পাইতেছি মনে হইল।

দূরে গলা শোনা গেল—কে যেন কিছু ফেরি করিয়া ফিরিতেছে, এমনই সুর করিয়া হাঁক। কাছাকাছি আসিতে বুঝিলাম সিতাংশুবাবুর গলা। আরও কাছে আসিলে বক্তব্যটাও অনুসরণ করিতে পারিলাম, তিনি হাঁকিতেছেন—কারো কিছু হারিয়েছে— ?

দরজার গোড়ায় পৌঁছিয়াই সিতাংশুবাবু সুর করিয়া বলিয়া উঠিলেন—অতি ছোট্ট জিনিস, কিন্তু বড়ই মূল্যবান; প্রমাণ ও এক প্যাকেট সিগারেট দিয়া যাঁহার জিনিস তিনি লইতে পারেন।

কমিটি মিটিং শেষে রামবাবু তখনও সিটে বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিলেন, তিনি ডাক দিলেন—সিতু, ওটি আমার জিনিস, দিয়ে যাও।

—তোমার জিনিস? তবে কি জিনিস নাম বল।

রামবাবু বলিলেন—তুমি যা বলছ, ঠিক তাই। জিনিসটী ছোট্ট কিন্তু মূল্যবান।

সিতুবাবু হাসিয়া ফেলিলেন—সে হচ্ছে না রামদা! জিনিসটী কি তা বলতে হবে, এখানে ফাঁকি চলবে না।

রামবাবু ফাঁকি দেন নাই, সত্য কথাই বলিতেছিলেন। ভোরের দিকে জামা গায়ে দিতে গিয়া দেখিতে পান যে, সোনার বোতাম-সেটটীর একটী বোতাম নাই। খবরটা জেলের সকলেই শুনিয়াছিল, কিন্তু বোতামটী পাওয়া যায় নাই। ফালতুদের ধমকানো, গায়ে হাতবুলানো, গোপনে ঘুষ দেওয়া প্রভৃতি যাবতীয় পন্থাই পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, কিন্তু বোতামটীর পাত্তা মিলে নাই।

রামবাবু বলিলেন—ফাঁকি দিচ্ছি না, আমার জিনিস, দেও। বলিয়া তিনি হাত বাড়াইলেন।

সিতুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমারই জিনিস, ঠিক তো?

—হাঁ, আমারই জিনিস, এর মধ্যে বেঠিকের কিছু নেই।

—খুব ছোট্ট জিনিস, কিন্তু মূল্যবান, হারালে বিষম ক্ষতি, কেমন?

রামবাবু হাসিয়া কহিলেন—সে তো বল্লামই, দেও। তোমায় এক প্যাকেট সিগারেট আমি দিয়ে দেব।

সিতুবাবু পূর্ববৎ সুরেই জিজ্ঞাসা করিলেন—Are you sure যে, এটা তোমার ?

—Certainly, নিশ্চয়।

—শেষে না বলবে না তো ?

রামবাবু বলিলেন—না।

—তবে নেও, বলিয়া সিতাংশুবাবু রামবাবুর প্রসারিত হস্তে সেই ক্ষুদ্র জিনিসটী স্থাপন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই একটা হো-হো অট্টহাসি উঠিল এবং একটা হৈ-হৈ পড়িয়া গেল।—

সিতুবাবু ছোট্ট একটী স্ক্রু রামবাবুর হাতে দিয়াছেন।

সিতুবাবুর গলা শোনা গেল—কেমন রামদা, তোমার জিনিস তো ?

—দেখ সিতু, ঠাট্টার একটা সীমা থাকে।

—চট্‌ছ কেন রামদা ? আমার কি দোষ ? এরকম একটা প্রয়োজনীয় জিনিস কার হারালো, তাকে তা ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত কি স্থির থাকা যায়, না থাকা উচিৎ, তুমিই বল রামদা ?

—ইয়ার্কি রাখ, দাঁত বার করলেই রসিকতা হয় না।

নেপাল বাড়ুয্যে সান্ত্বনাসুরে কহিল—রামদা, আপনি ঠাট্টাও বোঝেন না। সত্যিই কি আর আপনার স্ক্রু হারিয়েছে, না হারাতে পারে ?

ঘৃতে আহুতি পড়িল।

রামবাবু বিরাট ধমক দিয়া উঠিলেন—Shut up.

ধন্য নেপাল বাড়ুয্যে, এত বড় ধমকে বিন্দুমাত্র সংকুচিত হইল না। বলিল—রামদা আপনি চটে গেছেন। দিন, ওটাকে আমাকেই দিন। আমি স্বীকার পাচ্ছি যে, আমারই স্ক্রু ঢিলে হয়ে খসে পড়ে গেছে, ওটা আর কারো নয়।

হাসিঠাট্টার ব্যাপার, কিন্তু মারাত্মক মোড় লইতে দেখিয়া বয়স্ক ব্যক্তিরা মাঝে পড়িয়া রামবাবুকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া ধরিয়া শান্ত করিলেন।

বৃদ্ধ উপেন বাবু কহিলেন—যাও নেপাল, তোমার কাজে যাও। সিতু ভাগো।

সিতুবাবু অনুতপ্ত হইলেন। ক্রন্দনের সুরে গান গাহিতে গাহিতে ভাগিলেন—I found a screw but lost a friend. আমি একটী স্ক্রু পাইলাম, কিন্তু বন্ধু হারাইলাম। হায়—হায়—

রাত্রি মধ্যপ্রহরের নিকটবর্তী হইয়াছে—দণ্ডকয়েকের মধ্যে মধ্য-আকাশের সিংহদরজা পার হইয়া যাইবে। মহাশূন্যে গ্রহ-উপগ্রহরা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে স্থান পরিবর্তন করিতেছে—

নিমেষে নিমেষে নিযুত কোটি যোজন পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে।

নিম্নে সমুদ্র-মেখলা মেদিনী পাহাড়ে মাথা রাখিয়া গভীর ঘুমে এলাইয়া পড়িয়াছে। অঘোর ঘুমে অচেতন জীবজগৎ, অরণ্যজগৎ, জড়জগৎ তার বুকে কোলে পিঠে পড়িয়া আছে।

কোথা হইতে ঘুম নামিয়াছে! সমস্ত জেলটাকে বহু পূর্বেই গ্রাস করিয়া লইয়াছে। এ ঘরটায় খাটে খাটে ঘুমগ্রস্ত জীবন্ত শব সারি সারি শুইয়া আছে। সাড়া নাই, শব্দ নাই—শুধু ঘুমভরা অন্ধকার। এ কী মূর্তি আকাশ-পৃথিবীজোড়া জগৎসংসারের! এ কি কেবল অন্ধকার? শুধু সুষুপ্তি?—না, প্রলয়ের একটা পূর্বাভাস?

শুধু বন্দী আমি একা জাগিয়া আছি। সমস্ত সৃষ্টিকে প্রলয়ের অন্ধকারের মধ্যে নিরুদ্ধ সংহত করিয়া তারই শবাসনে ভীমা ভয়ংকরী তামসী রাত্রি ধ্যান-নিমগ্না। শুধু আমি জাগিয়া আছি—একা আমি।

আমিও যদি ঘুমাইয়া পড়ি? এই সৃষ্টি-লোপকারী প্রলয়ের শিয়রে প্রহরী কি কেহই তখন থাকিবে না? চেতনা নিভিয়া যাইতে চাহে যে! এই দৃশ্যের নিঃশ্বাসে প্রদীপশিখার মত চেতনা আমার চমকিত ও আন্দোলিত হইতেছে—প্রায় নিবু নিবু। বল, বল, আমি নিভিয়া গেলে, আমি ঘুমাইলে——কে জাগে?

দূরে নিদ্রাহারা নীড়ে নিশীথ রাতের পাখী ডাকিয়া উঠিল। চমকাইয়া উঠিলাম—আমি ঘুমাইলে কে জাগে, ঐ তো উত্তর আসিয়াছে। আমি ঘুমাইলে—বেদনা জাগে, জাগে মমতা।

রাত্রি মধ্যপ্রহর। বন্দী আমি আমার কারাগৃহে একা জাগিয়া আছি—একান্ত আমার আপন একটী বেদনাকে বুকে লইয়া। যে-বেদনা সৃষ্টিতেও চিরজাগ্রত, প্রলয়েও যে-মমতা অতন্দ্র এবং প্রলয়ের শেষে যে-বেদনার কোলে আদিম ঊষা আবার ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগে—সেই পরম বেদনার পাদমূলে আমার বেদনার প্রণামখানি নামাইয়া রাখিব। এবার আমার সময় হইয়াছে বলিবার—কেন আমার এই বেদনা!

সাত দিন আগের ঘটনা। ভোরে পত্রিকা আসিলে আমাদের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি পড়িয়া যায়, এক একখানা পত্রিকা লইয়া আমরা জড় হইয়া বসিয়া যাই। সেদিন একটা পাতা লইয়া আমিও একপাশে বসিয়া পড়িয়াছিলাম।

বাংলার খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও লেখকগণ "ফ্যাশি-বিরোধী সংঘ" গঠন করিয়াছেন, সংঘের অধিবেশনের বক্তৃতা ও বিবরণী খানিকটা পড়িয়াই মনটা বিরক্ত ও বিষাক্ত হইয়া উঠিল। দুর্ভিক্ষে বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক না খাইয়া পোকা-মাকড়ের মত মরিয়া গেল, কিন্তু বাংলার সাহিত্যিকদের লেখনী

হইতে কোন জ্বালা অথবা অভিশাপ অগ্নি-উদ্গারে নির্গত হইল না। আর আজ এ কি অধঃপতন তাঁহাদের? সমস্ত দেশের প্রাণ-শক্তিকে পশুর মত জেলখানার খাঁচায় আটকাইয়া বিদেশীরা যখন দেশব্যাপী ভাড়াটিয়া জুটাইয়া "জাপানকে রুখতে হবে" চীৎকার তুলিয়াছে, তখন এই অসম্মান ও অপমানের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ, কোন নিন্দাবাণীই বাংলার সাহিত্যিকদের লেখনী হইতে নির্গত হইল না। অথচ, 'বিশ্ব-সভ্যতা বিপন্ন' চীৎকার তুলিয়া তাঁহারাই আজ সমবেত হইলেন কিনা ফ্যাসি-বিরোধী-সংঘে! আজ তাঁহাদেরই হস্তের ক্লীব লেখনী গাণ্ডীবে রূপান্তরিত করিতে তাঁহারা চাহিতেছেন! বক্তৃতা ও বিবরণী সমস্তটুকু পড়িয়া লজ্জা ও গ্লানিতে মন ভরিয়া গেল—বাংলার সাহিত্যিকরা এ কোথায় আসিয়া নামিয়া দাঁড়াইলেন! বড় দুঃখেই মনে হইল—পঙ্কিল নর্দমায় আকণ্ঠ নিজেরা ডুবিয়া রহিয়াছেন, অথচ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন মানস-সরোবরের জল ঘোলা হইল এই দুর্ভাবনায়।

—শালা, এই বিশেষ ধরনের লরীর উৎপাত দেখছি দিন দিন বেড়েই চলেছে। লোকের জীবনের যেন আর বাপ-মা নেই।

—শ্যামাচরণবাবুর গলা।

পাশের সীটে একজন পাঠক উচ্চৈঃস্বরে পত্রিকা পড়িয়া যাইতেছিল, আর জন পাঁচেক শ্রোতা তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়া শুনিতেছিল। সেই সীটেই বিশ্বনাথ বাবু একপাশে পদ্মাসন করিয়া বসিয়া মুখে বিড়ি ফুঁকিতেছিলেন এবং কর্ণে সংবাদ-

পাঠ শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনি উচ্চাঙ্গের একটি নির্লিপ্ততার সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কজন খতম হোল শ্যামদা ?

শ্যামাচরণবাবু উত্তর দিলেন—সবিতা চৌধুরী নামে একটি মেয়ে।

সবিতা ? আমার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া একটা ঠাণ্ডা কি যেন সির-সির করিয়া নামিয়া গেল, বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল। পত্রিকা হইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কি নাম বল্লেন ?

শ্যামাচরণবাবু আমার প্রশ্নের উত্তরে খবরটুকু চেঁচাইয়া পড়িয়া গেলেন। তাহা হইতে জানা গেল—বালিগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বি; সি, চৌধুরীর সবিতা নামে একমাত্র মেয়ে, বয়স তেইশ, এম-এ ক্লাসের ছাত্রী, গতকাল রাত আটটার সময় গড়িয়াহাটা রোডে বিশেষ ধরনের লরীর নীচে চাপা পড়িয়া ঘটনাস্থলেই মারা গিয়াছে।

যুদ্ধ পরিচালনায় বা যথোচিত সমরায়োজনে পাছে কোন বিঘ্ন হয়, তাই এই জাতীয় ঘটনায় মিলিটারী লরীর উল্লেখ করা সরকার নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তাই দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ আইন বাঁচাইয়া লিখিয়া থাকে—বিশেষ ধরণের লরী। এই বিশেষ ধরণের লরীর তলায় পড়িয়া মৃত্যুর খবর প্রত্যহই পত্রিকায় একটি বা দুইটি দেখা যাইত। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি বহুবার আকর্ষণ করা সত্ত্বেও অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই, মিলিটারী লরীর বেপরোয়া গতি একটুও সংযত হয় নাই, বরং এই

অপমৃত্যুর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছিল। সেই বিশেষ ধরনের লরীর নীচেই এই মেয়েটির বিশেষ ধরনের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

শ্যামাচরণবাবু আমার মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—চেনেন নাকি?

মুখে ঈষৎ হাসিই আসিয়া গেল, কহিলাম—না, চিনিনা।

কত অনায়াসে কত বড় মিথ্যা কথা, তাও আবার ঈষৎ হাস্যের সঙ্গে আমি বলিয়াছি—সবিতাকে আমি চিনি না, জানি না। আমি তো আমি, আমার শরীরের প্রতিটী রক্ত-বিন্দু পর্যন্ত যার পায়ের শব্দ চিনে, তাকেই নাকি আমি চিনি না—জানি না। যে না-আসা পর্যন্ত আমার অস্তিত্বের কোন অর্থই ছিল না—তাকে আমি চিনি না? তবে চেনা কাকে বলে, জানা কাকে বলে—বলিতে পার?

জেলে আসার আগের দিন তার সঙ্গে শেষ দেখা। আজও মনে আছে, সেদিন পশুর মত ব্যবহার করিয়াছিলাম। বাড়ী ঢুকিতেই বারান্দায় ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা, সৌম্য শান্ত প্রৌঢ়ের মুখে স্নেহস্নিগ্ধ একটী হাসির অভ্যর্থনা, কহিলেন—যাও, সবিতা উপরে আছে।

উপরে তার ঘরে পর্দা ঠেলিয়া ঢুকিতেই সোফা ছাড়িয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, একটি রঙ্গীন প্রজাপতির মত উড়িয়া আসিয়া দুই হাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। বুকে লগ্ন হইয়া নেশাখোরের মত আবোল-তাবোল ভাষায় বলিতে লাগিল—সমর, আমার সমর।

গলা হইতে তাহার হাত দুইটা দুই হাতে খসাইয়া লইয়া একটু দূরে সরাইয়া রাখিয়া রুক্ষ কণ্ঠে কহিলাম—একি বিশ্রী স্বভাব! চরিত্র বলে কি কোন বস্তু মেয়েদের থাকতে নেই?

কঠিন হস্তে নিক্ষিপ্ত ব্যাধের বর্শা মৃগশিশুর মর্মভেদ করিয়া গিয়াছে—মর্ম হইতে রক্ত উৎসারিত হইয়াছিল, কিন্তু বেদনার পথে তাহা জল হইয়া দুইটী চোখে টলটল করিয়া উঠিল। চোখ তার জলে ভাসিতেছে, আর সে নিজে ভাসিতেছে বেদনার সরোবরে একটি পদ্মের মত।—ভূলুণ্ঠিত আহত পাখীকে যেন সযত্নে ধরিয়া তুলিতেছি, এমনইভাবে সোফায় গিয়া তাকে লইয়া বসিলাম। নিজের ভুল আমি বুঝিতে পারিলাম।

সেদিন সবিতা আমাকে বলিয়াছিল—আমাকে দেখলে তুমি কঠিন হয়ে ওঠ।

কথাটা ঠিক। স্রোতের মত চলিয়াছি, সবিতার সান্নিধ্যে, স্পর্শে চাঞ্চল্য আমার থামিয়া যায়। জানি না, কেন এমন হয়। আমার স্বভাবের উপরের দিককার স্রোত-চাঞ্চল্য খসিয়া পড়ে, ভিতরের মানুষটী বরফের মত জমাট বাঁধিয়া কঠিন হয়।

আমার সমস্ত আমিকেই যেন সবিতা একটী বিন্দুতে কেন্দ্রস্থ করিতে চাহে।—

শুনিয়া যাইতে লাগিলাম।

—কিন্তু তুমি জান না, তোমাকে দেখলে আমার কি অবস্থা হয়। আমার শরীর মন সমস্ত কিছু খসে যেতে চায়। তুমি ভাব, এ আমার চরিত্রহীনতা। কিন্তু এ যে আমার আসল চরিত্র, এ তুমি কেন বোঝ না। তোমাকে কেমন করে বুঝাব যে, সে কি আমার অসহ্য ইচ্ছা—আমার সমস্ত শরীর জল হয়ে মাটি হয়ে আলো হয়ে বাতাস হয়ে সব কিছুর সঙ্গে মিশে যাক, একাকার হয়ে যাক, তবে যেন আমার সাধ মেটে। তুমি এলে, আনন্দ আর আমি ধরে রাখতে পারি না। তুমি আমার আনন্দ—এ কি তুমি কোনদিন বুঝবে না ?

দুই কান পাতিয়া সবিতার কথাগুলি পান করিতে ছিলাম— রৌদ্রদগ্ধ মাটি যেমন করিয়া আকাশের মেঘবর্ষণকে শুষিয়া লয়। জলভারে মন্থর সঘন মেঘ—বুকে তার বিদ্যুৎ-বজ্রকেও বহন করিয়া থাকে। সজল বর্ষণের ধারাপথে এতক্ষণে সেই বিদ্যুত-বজ্রও নামিয়া আসিল—বুক পাতিয়াই তাহা গ্রহণ করিলাম।

—তুমি ব্যথা পাও, এ আমি কোনদিন চাই না। তোমার ব্যথা আমি সইতে পারি না। তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি, জন্মান্তরে তুমি আমাকে বড় ব্যথা দিয়েছিলে। তাই তো আমি এত ভয়ে ভয়ে থাকি পাছে তোমাকে ব্যথা

দেই। আজ তুমি বুঝবে না, কিন্তু যখন আমি থাকব না, তখন তোমাকে কাঁদতে হবে—আমাকে যেমন কাঁদিয়েছিলে। তখন সারা পৃথিবীতে তুমি আমাকে কেঁদে কেঁদে খুঁজবে। তুমি বুঝলে না—আমি তোমার কে। উপায় নেই, আমার জন্য তোমাকে কাঁদতে হবে।

মাত্র ছয়টি মাসের চেনা ও জানার শেষে এই আমাদের পরিচয় একের কাছে অপরের। সেই সবিতার শরীরের উপর দিয়া ভারী লরী অনায়াসে চলিয়া গেল! সমস্ত শরীর-মন-প্রাণ গলাইয়া বিশ্বভুবনে আনন্দে যে মিশাইয়া দিতে পারিত, তাহাকে দলিত পিষ্ট করিয়া মাংসস্তুপে রাস্তার উপর ফেলিয়া গেল। শ্মশানের আগুন কিন্তু বিকৃত মাংসস্তুপকে পরম স্নেহে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে।—

সবিতা মিথ্যা কথা বলিয়াছে। সে বলিয়াছিল, আমাকে কাঁদিতে হইবে। আমি কাঁদি নাই, বরং ঈষৎ হাস্যের সঙ্গেই বলিয়াছি—তাকে আমি চিনি না, জানি না। বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র সাত দিন সাত রাত্র আগে।

কিন্তু তাহাকে খোঁজার কথাটা? সে ও কি মিথ্যা? আমিতো জানি, আমার আকাশে সবিতা সূর্য হইয়া আসিয়াছিল—সে সূর্য নিভিয়া গিয়াছে। সূর্য নিভিয়া গেলে কি হয়, বলিতে পার কি?

পৃথিবীর সূর্য কোনদিন নেভেনা, হারায় না—শুধু উদয়-অস্তের দুই তটে আলো-অন্ধকারের খেয়া পারাপার করে অনন্তকাল

ধরিয়া। সূর্য নিভিয়া যাওয়ার অর্থ পৃথিবী জানেও না, বুঝিতেও পারিবেনা, কারণ পৃথিবীর আকাশ হইতে সূর্য কোনদিন অদৃশ্য বা অস্তমিত হইতে পারে না—এমনই অছেদ্য গ্রন্থি-বন্ধন পৃথিবী ও তার সূর্যের মধ্যে।

কিন্তু জীবনের আকাশে সূর্য কম লোকেরই উঠে। কারো ভাগ্যবশে যদি সে সূর্য উঠে এবং ভাগ্যদোষে যদি সে সূর্য এমন করিয়া হারাইয়া যায়—তাহার কি অবস্থা হয় বলিতে পার? তাহাই আমি আজ জানিতে চাই। পৃথিবীর সূর্য তো নিত্য রাত্রিপ্রভাতে নিজেই দেখা দেয়। কিন্তু জীবনের আকাশ হইতে সূর্য কোথায় সরিয়া যায়, বলিতে পার কি?

সবিতা বলিয়াছিল, তাহাকে খোঁজ করাই একদিন আমার জীবনের একমাত্র কাজ হইবে। তাহা যে এমন মর্মান্তিক-ভাবে সত্য হইবে, তখন বুঝিতে পারি নাই। সবিতার মৃত্যুর সাতদিন পরে আমার গভীর সুষুপ্তি হইতে সবিতার আহ্বান আসিয়াছে—সমর, সময় যে যায়।

সবিতার সূর্য-আহ্বান আমি শুনিয়াছি। এবার আমি চলিলাম—আমার আকাশের সূর্য-সন্ধানে। এই তমসাকে অতিক্রম করিয়া সেই আদিত্য-বর্ণ সূর্যের আলোক-আকাশে আমাকে জাগিতে হইবে।

হে আমার পৃথিবী, সূর্য-সন্ধানে সেই গভীর তমসার মধ্যে চলিতে গিয়া আমি যদি পথ হারাইয়া ডুবিয়া যাই, সবিতার সেই আলোতে আমি যদি জাগ্রত হইতে না পারি—তবে

আমার জন্য দুঃখ করিও না। সবিতার সংকেত আমি পাইয়াছি, সূর্যের আহ্বান আমি শুনিয়াছি—আমাকে যাইতেই হইবে।

আমি যদি নাই জাগি, হে পৃথিবী, তুমি যেন নূতন দিনের আলোতে সত্যই জাগিতে পার। প্রভাতে জাগিয়া যেন, হে পৃথিবী, তুমি দেখিতে পাও—মধুময় তোমার ধূলি, মধুময় তোমার বাতাস এবং মধুময় তোমার আকাশ।

তমসার তীর্থযাত্রী আমি, সুষুপ্তির পথের প্রান্তে দাঁড়াইয়া রাত্রির মধ্যপ্রহরে আমার এই কারাগৃহে একাকী জাগিয়া বসিয়া প্রার্থনা করিতেছি—

হে বন্ধু, তোমার পৃথিবী মধুময় হউক—তোমার পৃথিবী আনন্দময় হউক--তোমার পৃথিবী শান্তিময় হউক।

—বন্ধু, আমি চলিলাম—সূর্য-সন্ধানে।

ব্রতীসঙ্ঘ গ্রন্থাগার